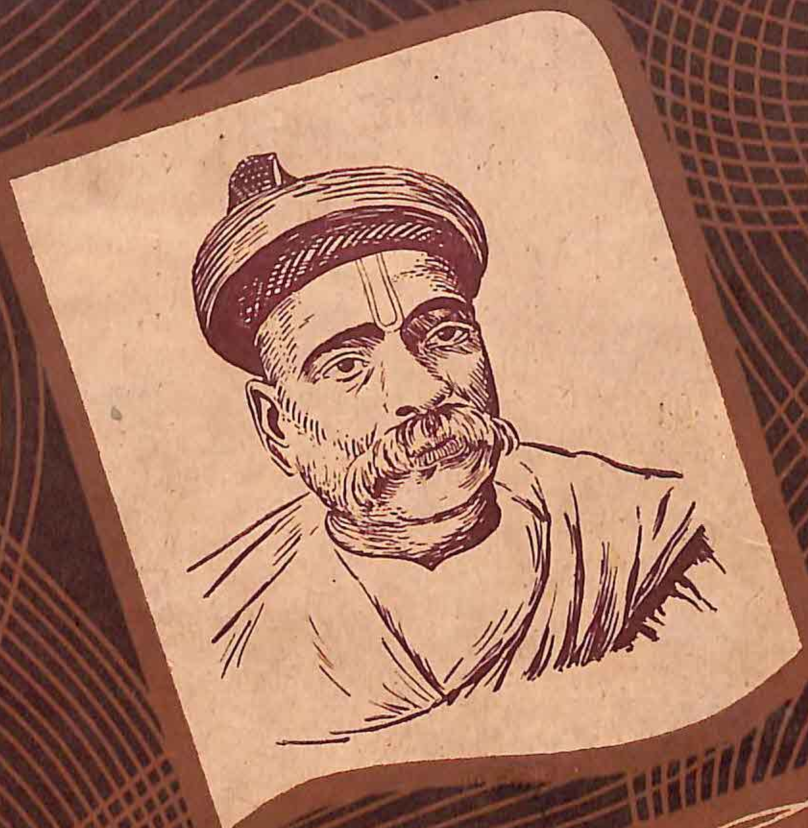


লোকমান্য তিলক

লোকমান্য তিলক

ঋষি দাস

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭

দাম : এক টাকা চার আনা মাত্র

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬
সাধারণ প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

লোকমান্য তিলক

এক

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা প্রধান সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ভারতের প্রতি ভালোবাসা ও বৃটিশের প্রতি ঘৃণাই ছিল তিলকের জীবনের মূলকথা। এই দু'টি জিনিসই তাঁর জীবনকে এক অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল।

শিবাজী মারাঠা জাতিকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন। তারপর পেশোয়াগণের শাসনকালে মারাঠারা ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু পেশোয়া মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর মারাঠাজাতি গৃহ-বিবাদের ফলে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইংরেজদের পদানত হয়। মারাঠাজাতি তাদের এই পতনকে নীরবে মেনে নিতে পারেনি। তাই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীরা যখন ভারতে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে তুলেছিল, তখনও এই মারাঠারাই ছিল তাদের অগ্রণী। পেশোয়ার উত্তরাধিকারী নানা সাহেবই ছিলেন সেই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি।

পেশোয়াদের আদি বাসস্থান ছিল বোম্বাই ও গোয়ার মধ্যবর্তী কোঙ্কান অঞ্চলে। তাঁরা ছিলেন চিৎপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বালগঙ্গাধর তিলকও এই কোঙ্কান অঞ্চলের রত্নগিরিতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পেশোয়াদের মতো তিনিও ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তাই বীর পেশোয়াদের আদর্শ ও ঐতিহ্য যে তাঁকেও অনুপ্রাণিত করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

বালগঙ্গাধরের প্রপিতামহ কেশব রাও শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের আমলে একজন মামলতদার (রাজস্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারী) ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ইংরেজরা পেশোয়া পদ তুলে দেয়। কেশব রাও ইংরেজদের অধীনে চাকরি করতে অসম্মত হন এবং চাকরি ছেড়ে ধর্মচর্চায় জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

কেশব রাওয়ের এক পৌত্রের নাম গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও। গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও বাল্যকালেই বাড়ি ছেড়ে পুনায় চলে আসেন এবং সেখানে আপনার চেষ্টায় কিছু লেখাপড়া শেখেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র সতের বৎসর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনায় একটি মারাঠী স্কুলে চাকরি করতে বাধ্য হন। সংস্কৃত, গণিত ও ইতিহাসে গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। তিনি পরে রত্নগিরি হাই স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ক্রমিক পদোন্নতির ফলে অবশেষে বিদ্যালয়সমূহের একজন ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টরের পদ পান। তিনি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বইও লেখেন। বইগুলি খুব ভালো হওয়ায় সরকারী শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয়সমূহের জন্য ঐ বইগুলি কিনে দেন। গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও কেবল শিক্ষকতা, পুস্তকরচনা ও বিদ্যালয় পরিদর্শনেই কৃতিত্বের পরিচয় দেননি, তিনি বৈষয়িক ব্যাপারেও যথেষ্ট যোগ্যতা দেখান।

বাল্যকালেই গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে প্রভাবতী নামে এক বালিকার বিবাহ হয়েছিল। গঙ্গাধর ও প্রভাবতীর পর পর তিনটি কন্যা হয়। ফলে তাঁরা উভয়েই একটি পুত্র লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রভাবতী দীর্ঘকাল উপবাস ও ব্রত করতে থাকেন। অবশেষে তাঁদের এক পুত্র হয়। তাঁরা পুত্রের নাম রাখেন বলবন্ত রাও। বলবন্তকে সকলে আদর ক'রে ডাকতেন "বাল"। পরে এই "বাল" নামেই বলবন্ত সুপরিচিত হয়েছিলেন, বালগঙ্গাধর তিলক নামেই তিনি অমর হয়ে আছেন ইতিহাসে। ভারতবাসীরা তাঁকে বলে "লোকমান্য তিলক", আর মারাঠীরা বলে "তিলক ভগবান।"

দুই

বাল্যকালে বালগঙ্গাধর তাঁর বাবার কাছেই লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন। ফলে সংস্কৃত, গণিত ও মারাঠী ভাষা শিক্ষায় তিনি খুবই উৎসাহ পান। তাঁর বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁর মা মারা যান। ঐ বৎসরই তাকে পুনা সিটি স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। তিনি স্কুলে পড়াশুনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। ফলে, একবার তাঁকে "ডাব্‌ল্ প্রমোশন" দেওয়া হয়।

যখন তিনি স্কুলে পড়তেন, তখন মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে, তাঁর সঙ্গে তাপিবাঈ নামে এক বালিকার বিবাহ হয়। বালগঙ্গাধর তাঁর শ্বশুরের কাছে যৌতুক হিসাবে কিছু বই চেয়ে নেন। পরের বছর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার অকালমৃত্যুর ফলে মানসিক

দিক থেকে তাঁর কিছু ক্ষতি হ'লেও তাঁকে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়নি। কারণ তাঁর বাবা তাঁর জন্য যে পরিমাণ টাকাপয়সা রেখে গিয়েছিলেন, তা তাঁর উচ্চ শিক্ষা লাভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বালগঙ্গাধর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে ডেক্কান কলেজে এসে ভর্তি হলেন। ছোটবেলায় তাঁর শরীর খুব দুর্বল ছিল; তাই তিনি কলেজে পড়বার সময় শরীরচর্চার দিকে বিশেষ ভাবে জোর দেন। এমন কি সেজন্য পড়াশুনোর প্রতিও কিছু পরিমাণে অবহেলা করতে থাকেন। একবার তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল্‌ও করেন। শরীরচর্চার ফলে তিনি শীঘ্রই সবল ও সুগঠিত দেহের অধিকারী হন। সাঁতার কাটায় তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রোগভোগের পর তাঁর শরীর কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি একবার গঙ্গা সাঁতরে পার হয়েছিলেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতে রুটি নিয়ে জলে ভেসে থাকতেন, কিন্তু তাতেও ঐ রুটি জলে ভিজতো না। আড্ডা দিতে, গল্পগুজব করতে, দুষ্টামি ক'রে বন্ধুদের জব্দ করতে তাঁর জোড়া ছিল না। তাই কলেজ-জীবনে তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও ছিল অনেক।

বই পড়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তবে কলেজে নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে বাইরের বই পড়াতেই ছিল তাঁর বেশী আগ্রহ। পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না; তাঁর লক্ষ্য ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করা। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স্‌ পেয়ে বি. এ. পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর তিনি আইন পড়তে থাকেন। ১৮৭৯

খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় পাস ক'রে তিনি এল-এল. বি. (LL. B.) উপাধি পান।

এইভাবে তাঁর স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ হয়।

তিন

আইন পরীক্ষায় পাস করলেও ওকালতি করা তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তাঁর পিতার জীবন ও চরিত্রের প্রভাব তাঁর ওপর বিশেষভাবে পড়েছিল। তাই শিক্ষাদানকেই তিনি জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাও তাঁর মনঃপূত ছিল না। তাঁর পিতার মতো সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কোনও চাকরি নিতেও তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি চাইছিলেন দেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে, যা দিয়ে দেশের জনসাধারণ অল্পব্যয়ে শিক্ষালাভ করতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হবে। কেবল তাই নয়, এই ধারণাও তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, কেবল শিক্ষার বিস্তারের দ্বারাই ভারতবাসীকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতন করা সম্ভব। ভারতের উন্নতির জন্যে সর্বাগ্রে চাই দেশময় শিক্ষার বিস্তার। ঐ সময় দেশের অন্যান্য অনেক তরুণও ঐরকম চিন্তা করছিলেন। তাই এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহী সহযোগীর অভাব হ'লো না।

তিনি যখন আইন পড়তেন, তখন তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন, নাম জি. জি. আগারকর। বালগঙ্গাধর ও আগারকর

এ নিয়ে দীর্ঘ অলোচনা করতেন। এখন তাঁরা স্থির করলেন, পুণাতেই একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বিষ্ণু চিপ্‌লুংকর, মহাদেব নামযোশী এবং বামন আপ্তে নামে আরো তিন ব্যক্তির সাহায্য পেলেন। তারপর তাঁরা পাঁচজন মিলে স্থাপন করলেন একটি আদর্শ বিদ্যালয়—'দি নিউ ইংলিশ স্কুল'। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতি হ'তে লাগল এবং এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি সরকারী কর্তৃপক্ষও এই বিদ্যালয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন।

তিলক ও তাঁর বন্ধুরা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না। জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের সচেতন ক'রে তোলার জন্যে তাঁরা দু'খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। একখানি প্রকাশিত হ'লো ইংরেজীতে—নাম "মারাঠা"; অপরখানি প্রকাশিত হ'লো মারাঠীতে—নাম "কেশরী"। তিলক ও আগারকর এই পত্রিকা দু'খানির সম্পাদনা করতে লাগলেন। তাঁরা নির্ভীকভাবে ইংরেজ সরকারের কাজেরও সমালোচনা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দু'খানি কাগজই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

ইংরেজগণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে পদানত ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি। ঐ সকল রাজ্যের রাজাদের উপরও নানাভাবে অবিচার করতো। এ সমস্ত ব্যাপারে তিলক ও আগারকর নির্ভীকভাবে সমালোচনা করতেন। কোলাপুরের মহারাজার মানসিক বিকৃতি ঘটেছে এই অভিযোগে ইংরেজরা তাঁকে অপসারিত করতে চাইলে সারা

মহারাষ্ট্রে তা নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিলো। সকলেরই সন্দেহ হ'লো যে, এই অভিযোগ মিথ্যা এবং মহারাজার মন্ত্রীর সঙ্গে যোগসাজস ক'রে ইংরেজরা মহারাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাইছে। "মারাঠা" ও "কেশরী" পত্রিকাতেও এই রকম সন্দেহ প্রকাশ করা হ'লো। ফলে মহারাজার মন্ত্রী মাধব রাও বার্ভে তিলক ও আগারকরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন। মামলায় তিলক ও আগারকর পরাজিত হলেন, তাঁদের চার মাস ক'রে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হ'লো।

কারাগারে তাঁদের সাধারণ কয়েদীর মতো রাখা হ'লো। তখনকার দিনে সাধারণ কয়েদীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এই কয়েক মাসেই তিলকের ওজন পঁচিশ পাউণ্ড কমে গেল।

কিন্তু যেদিন তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন, সেদিন বুঝলেন, এই কয়েক মাসেই দেশের জনসাধারণের চক্ষে তাঁর আসন অনেকখানি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁকে ও তাঁর সহকারী আগারকরকে অভিনন্দিত করবার জন্যে শত শত লোক জেলের দরজায় এসে হয়েছে সমবেত। তারপর বোম্বাই থেকে পুনা পর্যন্ত সমস্ত পথে তাঁদের কী অভিনন্দন! পুনার রেল স্টেশনে এসে যখন তাঁরা পৌঁছলেন, তখন দেখলেন কাতারে কাতারে লোক তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হচ্ছে!

তিলকের জনপ্রিয়তা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্কুল ও কাগজের জনপ্রিয়তাও খুবই বেড়ে গেল। এখন তিলক একটি আদর্শ কলেজ স্থাপনের কথা ভাবতে লাগলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনায় একটি জনসভায় 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। এই সমিতির লক্ষ্য হবে অল্প ব্যয়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করা ও দেশে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যায় স্কুল-কলেজ গ'ড়ে তোলা। তিলকের প্রস্তাব অনুসারে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, বিচারপতি তেলাং প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরাও এই সমিতির পরিচালক সভায় রইলেন। এই সমিতি স্থাপনের মাত্র দু'মাস বাদেই একটি কলেজ স্থাপিত হ'লো। এই কলেজের জন্য আশী হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে পাওয়া গেল। ঐ সময়ে বোম্বাইয়ের গভর্নর ছিলেন স্যার জেমস্ ফার্গুসন। তাঁর নাম অনুসারে ঐ কলেজের নাম হ'লো 'ফার্গুসন কলেজ'। ফলে সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে সহজেই অর্থ সাহায্য পাওয়া গেল। এইভাবে পাঁচ বছরের মধ্যে কলেজের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নতি হ'লো।

কলেজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিলকের সহকর্মীরা তাঁদের আত্মত্যাগের আদর্শ ভুলে গেলেন। তাঁদের কাছে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের চেয়ে অর্থোপার্জনটাই বড়ো হয়ে উঠলো। তাঁরা কলেজে কাজ করতে করতে অন্য কাজ করতে লাগলেন। তিলক এই আদর্শচ্যুতি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন, দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতির সদস্যরা সমিতির কাজ ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সমিতির অন্যান্য সদস্যদের মতবিরোধ ঘটলো। এই সময়ে সমাজ সংস্কারের ব্যাপার নিয়েও আগারকরের সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিলো।

আগারকর ছিলেন দ্রুত সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী। তিনি বললেন, আইন ক'রে আমাদের সমাজে যা কিছু কুসংস্কার আছে, তা অবিলম্বে দূর করা হোক। কিন্তু তিলক বললেন, তাতে জনসাধারণের ওপর জুলুম করা হবে। আইন ক'রে কখনও প্রকৃত সমাজ সংস্কার করা যায় না। শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা জনসাধারণকে কুসংস্কার সম্পর্কে আগে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। তাহ'লেই কুসংস্কারগুলি একে একে আপনা থেকেই দূর হবে। এই সময়ে তরুণ যুবক গোপালকৃষ্ণ গোখেল দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতির সভ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি 'সার্বজনিক সভা' নামে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর পদ-ও নিলেন। তিলক এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, গোখেল ফার্গুসন কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি যদি বাইরের কাজে মন দেন, তাতে অধ্যাপনার ক্ষতি হবে। সুতরাং গোখেলের পক্ষে ঐ পদ নেওয়া উচিত হবে না।

তিলকের এই মত কিন্তু তাঁর সহযোগীদের মনঃপূত হ'লো না। তাঁরা তিলককে তাঁদের শত্রু ব'লেই মনে করতে লাগলেন। ফলে তিলক দুঃখে ক্ষোভে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। এখন থেকে সমিতির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রইলো না।

চার

'দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি' কেবল শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু "মারাঠা" ও "কেশরী" কাগজ দু'খানি

ঐ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হ'লেও সেগুলি কেবল শিক্ষা-বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেগুলি রাজনীতির ক্ষেত্রেও নির্ভীকভাবে পদার্পণ করেছিল এবং সেগুলির বৃটিশ-বিরোধী বলিষ্ঠ নীতিই সেগুলিকে সারা মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। তাই এই কাগজ দু'খানি শিক্ষা সমিতির কাছে এক সমস্যা হয়ে উঠল। কারণ, স্কুল ও কলেজ ঠিকমতো চালাবার জন্য বা দেশে সেগুলির সংখ্যা বাড়াবার জন্য সরকারী সাহায্য অপরিহার্য। অন্যপক্ষে, "মারাঠা" ও "কেশরী" যদি বৃটিশ-বিরোধী নীতি ত্যাগ করে, তবে তা কেবল ঐ কাগজ দু'খানির জনপ্রিয়তাই নষ্ট করবে না, তা হবে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমান। এই অবস্থায় শিক্ষা সমিতি কাগজ দু'খানির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছেদ করতে চাইলো। কাগজ দু'খানি জনপ্রিয় হ'লেও আদৌ লাভজনক ছিল না। তাই কে এই কাগজ দু'খানি চালাবার দায়িত্ব নিতে যাবে? আবার তিলকই এগিয়ে এলেন। তিনিই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে "কেশরী" ও "মারাঠা" কাগজ দু'খানির একমাত্র মালিক হলেন। এই সময়ে কাগজ দু'খানির সাত হাজার টাকা দেনা ছিল। তা তাঁর ঘাড়েই পড়ল।

স্কুল ও কলেজ থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে তিলক বিশেষ কিছু পেতেন না। তবু যা পেতেন, তাতে কোনও রকমে তাঁর সংসার চলে যেতো। কিন্তু এখন স্কুল ও কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকায় সেই সামান্য আয়ও রইলো না। কিন্তু তাতেও তিলক ভয় পেলেন না। তিনি হঠাৎ তাঁর কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, তিনি আইনের ছাত্রদের পড়াবার জন্যে ক্লাস খুলছেন, ছাত্ররা

অল্প ব্যয়ে তাঁর ক্লাসে যোগ দিতে পারেন। তাঁর এই নূতন পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হ'লো। ছাত্ররা দলে দলে এসে তাঁর ক্লাসে ভর্তি হলেন। এমন কি অনেক উকিলও তাঁর ক্লাসে এসে ভর্তি হলেন। হিন্দু আইন সম্পর্কে তিলকের অসাধারণ জ্ঞানের কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলো। কেলকর ও হরিনারায়ণ গোখেল তিলকের কাগজে সহকর্মী ছিলেন। আইন শিক্ষা দানের জন্য তিলক তাঁদেরও সহযোগী হিসাবে নিয়োগ করলেন। এইভাবে তিলকের জীবিকা উপার্জনের একটা ব্যবস্থা হ'লো।

আইনের স্কুল ও কাগজ দু'খানির মধ্যেই কিন্তু তিলকের অসামান্য কর্মশক্তি সীমাবদ্ধ রইলো না। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই কয়েক বছর তিলক ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শিক্ষাবিস্তারের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করাই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু এখন শিক্ষা সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় তিনি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কংগ্রেসের জন্য কাজে নামলেন। ঐ বৎসর বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। তিলক পুনা থেকে দশ হাজার টাকা সংগ্রহ ক'রে পাঠালেন। ঐ অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধি হিসাবেও যোগ দিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ ঐ বৎসর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের তিন জন নেতা সর্বপ্রথম কংগ্রেসের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই তিনজন হলেন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় এবং গোপালকৃষ্ণ গোখেল। ঐ বৎসর পুনায় বোম্বাই প্রাদেশিক সভার

যে বার্ষিক অধিবেশন হ'লো তাতেও তিলক অন্যতম নেতারূপে দেখা দিলেন।

কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা বোম্বাই প্রাদেশিক সভা তখনও ঠিক বৃটিশ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি। সেগুলি তখনও ইংরেজদের কাছে আবেদন-নিবেদনের পথকেই দেশের উন্নতির পথ ব'লে মনে করতো। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃটিশ-বিরোধী ক'রে গ'ড়ে তুলবার মহান্ দায়িত্ব তিলকের ওপরই পড়েছিল। তবে তিলক প্রথম দিকে বৃটিশ-বিরোধী প্রচারকার্যের জন্য কংগ্রেন বা প্রাদেশিক সভার মঞ্চের চেয়ে তাঁর কাগজ দু'খানিকেই বেশী ব্যবহার করেছিলেন। চীনদেশে ইংরেজরা যেমন আফিমের ব্যাবসা ক'রে সারা দেশটাকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিতে চেষ্টা করেছিল, ভারতবর্ষেও তেমনি তারা করছিল মদের ব্যাবসা। মদের ব্যাবসার প্রসারের জন্য ইংরেজ সরকারের আবগারী বিভাগগুলি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করত। তাদের একান্ত লক্ষ্য ছিল আবগারী বিভাগের আয় যথাসম্ভব বাড়ানো। তাতে ভারতীয়দের সর্বনাশ করা হচ্ছিল। তিলক তাঁর কাগজে সরকারের আবগারী নীতির নিন্দা করতে লাগলেন। ঐ সময়ে লবণের উপর যে কর বসানো হয়েছিল, তাতে জনসাধারণের দুর্দশার সীমা ছিল না। তিলক এই লবণ আইনের বিরুদ্ধেও তাঁর কাগজে তীব্র সমালোচনা করতে লাগলেন। লবণ আইন সম্পর্কে একখানি চিঠি ছেপে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হ'তে বসলেন। এই চিঠিখানি লিখেছিলেন রাস্‌ডেন নামে জনৈক ইংরেজ—মাঞ্চেস্টার থেকে। এই চিঠিতে রাস্‌ডেন

ভারতবাসীকে লবণ আইন অমান্য ক'রে নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাস্‌ডেনের এই পরামর্শ তিলকের অত্যন্ত মনঃপূত হয়েছিল। নইলে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ঐ চিঠি কখনও ছাপতেন না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই চিঠি প্রকাশের কিছু কম অর্ধ-শতাব্দী বাদে মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন অমান্য ক'রে রাস্‌ডেন ও তিলক-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। তিলক সেদিন এই পথে অগ্রসর হ'তে পারেননি, তার একমাত্র কারণ, ভারত তখনও ঐ ধরনের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তিলক, লালা লাজপত রায় এবং বিপিন চন্দ্র পাল, এই তিনজন বিপ্লবী নেতার চেষ্টায় ভারত ধীরে ধীরে সেজন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এই ত্রিমূর্তি তাই "বাল" "লাল" "পাল" নামে পরিচিত।

কংগ্রেস তার বিভিন্ন অধিবেশনে সরকারের লবণ আইন, আবগারী আইন, বন সংক্রান্ত আইন ও অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে বার বার প্রস্তাব পাস করছিল। কিন্তু এইসব নিরীহ প্রস্তাবের প্রতি সরকার সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিল। সরকারের এই ঔদাসীন্য এবং 'বাল-লাল-পালের' ওজস্বিনী ভাষা ভারতকে ক্রমেই বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সকল সদস্য এই বিপ্লবের পথে অগ্রসর হ'তে চাইছিলেন না। তাঁদের কাছে আবেদন-নিবেদনের কুসুমাকীর্ণ পথই ছিল একমাত্র পথ। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন ফিরোজ শাহ্ মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রভৃতি নেতারা। এঁরা অদূর ভবিষ্যতে "নরমপন্থী" নামে

পরিচিত হয়েছিলেন। আর বাল, লাল ও পালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে যে বিপ্লবী দল গ'ড়ে উঠেছিল, তা-ই পরিচিত হয়েছিল "চরমপন্থী" নামে। এই দুই দলের মধ্যে কংগ্রেস কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল সত্য। কিন্তু তিলক ভারতকে বিপ্লবের যে কণ্টকাকীর্ণ পথ দেখিয়েছিলেন, সেই পথেই স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিজয়-রথ একদিন অগ্রসর হয়েছিল।

কেবল নির্ভীক বৃটিশ-বিরোধিতাই তিলকের একমাত্র নীতি ছিল না। কংগ্রেস মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধিত্ব করে ব'লে ঐ সময় অভিযোগ করা হ'তো। এই অভিযোগ মিথ্যা ছিল না। তিলক কংগ্রেসকে সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাইলেন। গ্রাম আর কৃষকের দেশ ভারতবর্ষ। এখন থেকে কংগ্রেসে গ্রাম ও কৃষকদের সমস্যা একটি প্রধান স্থান অধিকার করলো। এইভাবে তিলকই কংগ্রেসে গণ-আন্দোলনের বীজ বপন করলেন।

পাঁচ

শিক্ষাবিস্তার, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তিলক নানা বিষয় গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। ভারতবর্ষকে গভীরভাবে ভালোবাসায় ভারতের অতীত ও প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর অসীম কৌতূহল ছিল। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র, বেদ, বেদাঙ্গ, গীতা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সব কিছুই তাঁকে আকৃষ্ট করতো। গণিত ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য থাকায় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ঠিকমতো বুঝবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

ভারতে আর্যগণের আগমন এবং ঋগ্‌বেদের রচনাকাল সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা ও আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, ঋগ্‌বেদ খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে কোনও সময়ে রচিত হয়েছিল। তাঁরা সাধারণত বৈদিক সাহিত্যের বিকাশ ও ভাষার ওপর নির্ভর ক'রেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পরিশ্রমের পর তিলক অন্য এক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি ঋগ্‌বেদের রচনার কাল স্থির করলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে নবম প্রাচ্য সম্মিলন হচ্ছিল। ঐ সম্মিলনে তিলক একটি প্রবন্ধ পাঠালেন। প্রবন্ধটির নাম "মৃগশীর্ষ" (Orion)। পর বৎসর প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লো। প্রবন্ধটিতে তিলকের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গীতা পড়তে পড়তে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের একটি উক্তি তাঁর অদ্ভুত ঠেকল। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"মাসগুলির মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ" (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ)। বেদ, বেদাঙ্গ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত তিলক এই উক্তির পেছনে কী অর্থ আছে, তা উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে গভীরভাবে গবেষণা করতে লাগলেন। অবশেষে ঋগ্‌বেদে মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা নক্ষত্রের বিভিন্ন উল্লেখ ও সেগুলির ব্যাখ্যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সূর্য যখন মৃগশিরার সন্নিকটে ছিল, তখনই ঋগ্‌বেদ রচিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে তিনি প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল।

ঋগ্‌বেদের রচনার এইভাবে কালনির্ণয় ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা তিলকের মতকে মেনে না নিলেও তাঁরা তিলকের পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার বা তাঁর মতকে খণ্ডন করতে পারলেন না। বইখানি পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো।

ছয়

জনসাধারণের মধ্যেই যে জাতির প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে, তিলক তা ভালো ক'রেই জানতেন। তাই কিভাবে জনসাধারণকে জাগ্রত করা যায়, কিভাবে তাদের সংঘবদ্ধ করা যায়, সেই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। এই সমস্যার কিছুটা সমাধানের জন্য তিনি সারা মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসবের প্রচলন করেন। এই উৎসব প্রচলনের মধ্যে কিছুটা ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তিলক জানতেন, আমোদ-উৎসব ও ধর্মীয় চেতনার দ্বারা সাধারণ মানুষকে যতো সহজে সংঘবদ্ধ করা যায়, তেমনটি আর কিছুতে হয় না। ইউরোপের ইতিহাসেও বারে বারে তাই ঘটেছে।

'গণপতি উৎসব' প্রবর্তিত করার অন্য একটি কারণও ছিল। বোম্বাই প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ছিল। মুসলমানদের মহরমই ছিল বোম্বাই প্রদেশের জাতীয় উৎসব। মহরমে হিন্দু ও মুসলমানরা একসঙ্গে মিলিত হতেন। মহরমের সময় তাজিয়া বিসর্জনের যে মিছিল বেরোতো হিন্দু-মুসলমান সকলে তাতে একসঙ্গে মিলিত হতেন। মহরম

উৎসবের জন্য হিন্দুরা হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিতেন। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর এই নির্মল আকাশে অকস্মাৎ হিংসা-দ্বেষের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠলো।

বছরের পর বছর কংগ্রেস দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য দাবি জানাচ্ছিল। এই দাবির অর্থ ছিল দেশে পার্লামেণ্টারী বা প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসে যেসব মুসলমান সদস্য ছিলেন, তাঁরাও একবাক্যে এই দাবি সমর্থন করছিলেন। কংগ্রেসের এই দাবি ইংরেজদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। তাই ইংরেজরা এখন হিন্দু ও মুসলানদের মধ্যে বিরোধ ঘটাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আলিগড় কলেজ ছিল মুসলমানদের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বেক সাহেব। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কৌশলে বিভেদের বীজ বপন করলেন। তিনি বললেন, "ভারতে পার্লামেণ্টারী প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কারণ, পার্লামেণ্টারী প্রথা প্রবর্তিত হ'লে তাতে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের অধীন হয়ে পড়বে। তা মুসলমানরা কখনই শান্তচিত্তে মেনে নেবে না।" মুসলমান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নেতা স্যার সৈয়দ আমেদ খানও বেক সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করলেন। কেবল তাই নয়, এই সময় হিন্দুরা একটি মারাত্মক ভুল করলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে গো-হত্যা নিবারণের জন্য আন্দোলনকে ক্রমেই জোরালো করা হ'তে লাগলো। ইংরেজ শাসকরা এবং তাদের কৃপাপুষ্ট মুসলমান নেতারা এতে তাদের প্রচারকার্যে সুবিধা পেলো। অবশেষে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের

আগস্ট মাসে বোম্বাইয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভায়াবহ দাঙ্গা বাধলো। এই দাঙ্গায় বহু লোক হতাহত হ'লো।

উভয় সম্প্রদায়ের চেষ্টায় দাঙ্গা শীঘ্রই থেমে গেলেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেই সম্প্রীতি আর রইলো না। হিন্দুরা মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়া বন্ধ করলো। এইভাবে বোম্বাই প্রদেশের হিন্দুরা একটি বার্ষিক উৎসব থেকে বঞ্চিত হ'লো। কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই বার্ষিক উৎসব থাকে। ঐ ধরনের উৎসব ছাড়া জাতির প্রাণের উৎস ক্রমেই শুকিয়ে আসে। তিলক একথা ভালো ক'রেই জানতেন। তাই তিনি মারাঠাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসবের সন্ধান করতে লাগলেন। মারাঠাদের প্রায় ঘরে ঘরে গণেশের পূজো হয়ে থাকে। পেশোয়াদের আমলে এই গণেশের পূজোকে কেন্দ্র ক'রে বছরে বছরে যে উৎসব হ'তো, তা জাতীয় আকার ধারণ করেছিল। মারাঠাদের সে গৌরবের দিন আজ আর নেই, সেই জাতীয় উৎসবও গেছে। তিলক মারাঠাদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন, চাইলেন পুনরায় প্রবর্তন করতে 'গণপতি উৎসব'। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রয়াসে ও প্রেরণায় পুনায় আবার গণপতি উৎসবের সূত্রপাত হ'লো। অনন্ত চতুর্দশীর দিন গণপতির বিসর্জনের মিছিল মারাঠাদের সংঘবদ্ধ হবার এক নূতন পথ দেখালো। দু' বছরের মধ্যেই গণপতি উৎসব জাতীয় আকার ধারণ করলো। এমন কি মুসলমানরাও এই উৎসবে যোগ দিতে লাগলো। সারা মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসবের শত শত কেন্দ্র গ'ড়ে উঠলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল, পুনা ছাড়া আরও ৭২টি শহরে গণপতি উৎসব

বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হচ্ছে। কেবল মাদ্রাজ, যোধপুর, জয়পুর, মথুরা, বেনারস, দ্বারকা, করাচী বা কলকাতার মতো ভারতীয় শহরেই নয়, দূর আদেন ও নাইরবির মতো জায়গাতেও প্রবাসী ভারতীয়রা ঐ উৎসব পালন করছেন।

গণপতি উৎসবের মধ্য দিয়ে তিলক জাতীয় জাগরণের এক অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। আজকার সর্বজনীন পূজোগুলি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তিলক মহারাষ্ট্রে আরও একটি জাতীয় উৎসবের প্রবর্তন করেন, তা 'শিবাজী উৎসব'। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে "নেটিভ ওপিনিয়ন" নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজে শিবাজীর বিস্মৃতপ্রায় সমাধিমন্দির সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকও তাঁর বইয়ে শিবাজীর সমাধিমন্দিরের দুরবস্থা সম্পর্কে লেখেন—

"ঐ অদূরে পাহাড়ের ওপর মহারাজ শিবাজীর সমাধিমন্দির দেখা যায়। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ বৃক্ষ ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হয়েছে; বড় বড় গাছ এর চত্বরের পাথর ভেদ ক'রে উঠেছে; কাছেই যে মন্দিরটি রয়েছে, তারও দুরবস্থার সীমা নেই; মন্দিরের মধ্যস্থিত মূর্তি মাটিতে গড়াচ্ছে।.........আজ আর শিবাজীর কথা কেউ ভাবে না; শিবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরের সংস্কারের জন্য আজ কেউ বছরে একটি টাকাও খরচ করে না; অথচ এই শিবাজী মহারাজ বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।"

শিবাজীর সমাধিমন্দিরের প্রতি অবহেলাকে তিলক মারাঠা জাতির চরম আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ ব'লেই মনে করলেন। অবিলম্বেই তিনি এই জাতীয় কলঙ্ক মোচনের জন্য ডাক দিলেন। তিলকের এই আহ্বান বিদ্যুতের মতো সারা মহারাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়লো—মহারাষ্ট্র থেকে তা ছড়িয়ে পড়লো ভারতের অন্যান্য

অঞ্চলেও। ৩০-এ মে তারিখে পুনায় এক জনসভা হ’লো। তিলকের বিরুদ্ধবাদী “সুধাকর” পত্রিকাও উচ্ছ্বসিতভাবে স্বীকার করলো, ইংরেজদের এ দেশ অধিকারের পর এমন জনসমাবেশ দেখা যায় নি। সারা মহারাষ্ট্রের গরীব কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র থেকে ধনিক, বণিক, জায়গিরদার, সকলেই তিলকের ডাকে সাড়া দিলো। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি ও বৃটিশ সরকার নানাভাবে এতে বাধার সৃষ্টি করতে চাইলেও জনজাগৃতির এই প্রবাহের সামনে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ’লো। ১৫-ই এপ্রিল ছিল শিবাজীর জন্ম দিন। পর বৎসর (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ দিনটি রায়গড় দুর্গের উপরে শিবাজী উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হ’লো। “জয়, শিবাজীর জয়!” ধ্বনিতে ধ্বনিত হ’লো সারা মহারাষ্ট্র। শিবাজী উৎসবের তরঙ্গ সুদূর বাংলাদেশেও এসে পৌছলো। রবীন্দ্রনাথ এই শিবাজী উৎসবের উদ্দেশেই রচনা করলেন তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা—“শিবাজী উৎসব।”

শিবাজী মুঘলদের বিতাড়িত ক’রে মহারাষ্ট্রে এক স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই শিবাজী উৎসবের মধ্যে সেই কথা বারে বারে ঘোষিত হ’লো। ঘোষিত হ’লো পুনরায় স্বাধীন মহারাষ্ট্র তথা স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার অটল সংকল্প।

সাত

এই সময়ে মহারাষ্ট্রে অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল “সার্বজনিক সভা।” এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করছিলেন বিচারপতি মহাদেও গোবিন্দ রানাডে ও গোপালকৃষ্ণ গোখেল। রানাডে

ও গোখেল, দু'জনেই ছিলেন নরমপন্থী, তাঁরা বৃটিশ সরকারের কাছে সবিনয় অনুরোধ করাকেই জাতীয় উন্নয়নের একমাত্র পন্থা ব'লে মনে করতেন। তাই তিলকের নেতৃত্বে মারাঠী জনসাধারণ যে সংগ্রামী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল, তার সঙ্গে এই সভার নীতি ও কার্যকলাপের সংগতি ছিল না। তিলকও কয়েক বৎসর যাবৎ এই সভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা এখানে বেশী না হওয়ায় এই সভাকে বৃটিশবিরোধী নীতি ও পথ গ্রহণ করানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই তিলক এখন স্থির করলেন এই সংস্থায় তাঁর সমর্থকের সংখ্যা বাড়াবেন। ফলে তিলকপন্থীরা দলে দলে সার্বজনিক সভায় যোগ দিলেন। অবশেষে সার্বজনিক সভার নেতৃত্ব তাঁদের হাতেই এলো। সার্বজনিক সভাতেও এখন তিলক হলেন সর্বাধিনায়ক।

রানাডে ও গোখেলের "নরমপন্থী" দল মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকটি নির্বাচনে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিলক পুনার সিটি মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে বোম্বাইয়ে প্রাদেশিক আইনসভায় আটজন নির্বাচিত সদস্যের স্থান হয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন অনুসারে যখন নির্বাচন হ'লো, তখন তিলক প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন। রানাডে ও গোখেলের দল তাঁর বিরুদ্ধে একজন সরকারী কর্মচারীকে দাঁড় করালেন এবং তাঁরা ব্যক্তি-গতভাবে ঐ প্রার্থীর জন্যে প্রচার-কার্য চালাতে লাগালেন। গরুড় নামে এক জনপ্রিয় উকিলও প্রার্থিরূপে দাঁড়ালেন। কিন্তু

নির্বাচনে তিলকই হলেন জয়ী। তিলক পেলেন ৩৫টি ভোট, গরুড় পেলেন ২৬টি ভোট, আর রানাডে ও গোখেলের সমর্থিত প্রার্থী পেলেন ২টি ভোট। তিলকের নির্বাচনে সরকারী মহল ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজগুলি গভীর উদ্‌বেগ বোধ করতে লাগলো। "টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া" ও "বোম্বে গেজেটের" মতো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি তিলকের নির্বাচনকে বাতিল ক'রে দেওয়ার জন্য গভর্নরকে অনুরোধ করতে লাগলো—তিলকের মতো একজন রাজদ্রোহী গভর্নরের কাউন্‌সিলে আসন পাবেন, এর চেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার আর কি হ'তে পারে! ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে সে ক্ষমতা গভর্নরের ছিল। কিন্তু গভর্নর তা করলেন না। তিলকের জনপ্রিয়তার কথা তিনি জানতেন। তিলককে আইন সভায় স্থান দিলে তাঁর তাপ যদি কিছুটা কমে, এই আশায় তিনি তাঁর নির্বাচন মঞ্জুর করলেন। তিলক গভর্নরের আইনসভায় যোগ দিলেন। এতোদিন কাউন্‌সিলররা সরকারী প্রস্তাবে সবিনয় সমর্থন জানিয়ে নিজ নিজ খেতাব বজায় রাখতেন। কিন্তু তিলক কাউন্‌সিলে যোগ দিয়ে সরকারী বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন। এইভাবে ভারতে পার্লামেণ্টারী রাজনীতির গোড়াপত্তন হ'লো। এই নীতিই পরে মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য বিকাশ লাভ করেছিল।

দু' বছর বাদে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন আবার কাউন্‌সিলের নির্বাচন হ'লো, তখনো তিলক সগৌরবে নির্বাচিত হলেন। সারা মহারাষ্ট্রে সেদিন তাঁর চেয়ে জনসাধারণের যোগ্য প্রতিনিধি আর কে ছিল!

পরে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হ'লে স্বেচ্ছায় এই পদ ত্যাগ করেন।

আট

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত ঘটলো। পুনায় ঐ বছর কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'লো, তাতে কৃষকদের দুরবস্থার কথাই স্থান পেলো সবচেয়ে বেশী। তিলক এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বললেন, "প্রজাদের খাজনা অনেকক্ষেত্রে প্রায় সাতগুণ বাড়ানো হয়েছে। ভারত সচিব রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণের যে সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন, এতে তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। প্রজাদের এই দুরবস্থার প্রতিকার হওয়া চাই।"

পর বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইলো না। 'দুর্ভিক্ষ সাহায্য আইনে' দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে প্রজাদের খাজনা কমাবার বা মকুব করবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কালেক্টররা ঐ আইন কার্যকরী করতে চাইলো না। তারা প্রজাদের উপর জুলুম ক'রে খাজনা আদায় করতে লাগলো। প্রজাদের অধিকাংশকে ঘর-বাড়ি, ঘাট-বাটি, জিনিসপত্র বিক্রি ক'রে খাজনা মেটাতে হ'লো। প্রজাদের দুরবস্থা ও লাঞ্ছনার অবধি রইলো না। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাতে সাহায্য করবার জন্য ইংলণ্ডে একটি 'দুর্ভিক্ষ সাহায্য তহবিল' খোলা হয়েছিল। এবারও ঐ রকম সাহায্য তহবিল খোলার জন্য চারিদিকে দাবী উঠলো। কিন্তু ইংরেজ সরকার ঐ রকম তহবিল খোলার কোনও

প্রয়োজনীয়তা নেই ব'লে বার বার ঘোষণা করলো। কেবল তাই নয়, এই সময়ে রানী ভিক্টোরিয়ার শাসন কালের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মহাসমারোহে জয়ন্তী পালনের জন্য দেশময় প্রস্তুতি চলতে লাগলো। সরকারের এই সকল নির্লজ্জ হৃদয়হীনতা তিলক নীরবে সহ্য করলেন না। তিনি তাঁর কাগজে এ সম্পর্কে নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করতে লাগলেন। তিনি দুর্ভিক্ষ সাহায্য আইনের ধারাগুলি সম্পর্কে প্রজাদের সচেতন ক'রে দিতে চাইলেন। সার্বজনিক সভার সদস্যরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রজাদের বোঝাতে লাগলো যে, সরকার দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের জন্য খাজনা কমাবার বা মকুব করবার ব্যবস্থা রেখেছেন; কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ কালেক্টররা সেই সরকারী ব্যবস্থাকে কার্যকরী করছে না। তারা অতিরিক্ত খাজনা আদায় ক'রে নিজ নিজ পদোন্নতি চাইছে। এই অবস্থায় প্রজারা খাজনা দিতে অসমর্থ হ'লে তারা যেন কালেক্টরকে খাজনা না দেয় এবং আইনের সাহায্য নেয়। এ সম্পর্কে রাশি রাশি প্রচারপত্র ও পুস্তিকাও বিলি করা হ'লো।

তিলক ও তাঁর দলের লোকেরা এইরকম প্রচারকার্য চালাবার ফলে সরকার খুবই অসুবিধায় পড়লো। সার্বজনিক সভার সদস্যদের অনেককেই তারা গ্রেফ্‌তার করলো, অনেকের বিরুদ্ধে মামলা আনলো, অনেকের ওপর নানাভাবে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন চালালো। সার্বজনিক সভার সদস্যদের গ্রামাঞ্চলে চলাফেরা ও তথ্যসংগ্রহের কাজে তারা পদে পদে বাধা দিলো। তা সত্ত্বেও তিলক ও তাঁর অনুগামীদের অভিযান সফল হ'লো। বড়লাট

মহারাষ্ট্র পরিদর্শনে যেতে বাধ্য হলেন। ইংলণ্ডেও একটি দুর্ভিক্ষ সাহায্য তহবিল খোলা হ'লো। প্রজারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেকখানি সচেতন হ'লো।

ঐ বৎসর (১৮৯৬) কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। কংগ্রেসে দুভিক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা হ'লো। কিন্তু কংগ্রেসে নরমপন্থীদের নেতৃত্ব থাকায় তাঁরা এ বিষয়ে সরকারের কঠোর সমালোচনা করতে পারলেন না। তিলক এতে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং কংগ্রেসের এই নীতির তীব্র সমালোচনা ক'রে তাঁর "কেশরী" কাগজে প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি বললেন, "গত বারো বছর যাবৎ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কংগ্রেসের গলা ধ'রে গেল, কিন্তু সরকার তার কথায় কর্ণপাত করলো না।......আমাদের শাসকরা আমাদের কথা অবিশ্বাস করেন বা সেই রকম মনোভাব দেখান। এখন আমাদের উচিত কোনও শক্তিশালী গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারের কানে আমাদের অভিযোগগুলি জোর ক'রে প্রবেশ করানো। সেজন্য অবশ্যই আমাদের অজ্ঞ গ্রামবাসীদের যথাসম্ভব রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, তাদের সঙ্গে সমান হয়ে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে। কিভাবে গঠনতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম করতে হয়, তাও তাদের শেখাতে হবে। কেবল তাহ'লেই সরকার বুঝবে যে, কংগ্রেসকে ঘৃণা করাই হ'লো ভারতবাসীকে ঘৃণা করা। কেবল তখনই কংগ্রেসী নেতাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে।"

তিলক সেদিন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মহারাষ্ট্রের অক্ষম প্রজাদের

খাজনা দিতে নিষেধ ক'রে যে নীতির অনুসরণ করেছিলেন, তা সরকারী কাগজপত্রে "খাজনা বন্ধ অভিযান" নামেই অভিহিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে কংগ্রেস এই খাজনা বন্ধ অভিযানকে তাঁদের সংগ্রামের অন্যতম প্রধান অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেদিক থেকে তিলককেই প্রকৃতপক্ষে "খাজনা বন্ধ আন্দোলনের" প্রবর্তক বলা চলে।

নয়

কথায় বলে, মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। ঠিক তাই ঘটলো মহারাষ্ট্রে। দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার নরনারী ও গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছিল। তা যেন যথেষ্ট ছিল না। তাই দুর্ভিক্ষের পিছু পিছু এলো প্লেগরোগের মহামারী। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে এই প্লেগ রোগ প্রায় সর্বত্র দেখা দিয়েছিল। সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়লো পুনায়। প্লেগের বিভীষিকায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রইলো। রাজনৈতিক নেতারা অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পুনা ছেড়ে পালালেন। ধনী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যেও পলায়নের হিড়িক প'ড়ে গেলো। কিন্তু তিলক? তিনি জাতির এই দুর্দিনে নির্ভীকচিত্তে পুনাতেই রইলেন এবং আর্তের সেবায় অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

প্রথম দিকে প্লেগ সম্পর্কে সরকার নির্বিকার ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বন্দর থেকে যেসব জাহাজ ইউরোপে গেলো, সেগুলিকে ইউরোপের বন্দরে ঢুকতে দেওয়া হ'লো না। প্লেগের আতঙ্কে ইউরোপও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। এই অবস্থায়

সরকার "মহামারী ব্যাধি আইন" নামে একটি আইন পাস করলো। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল রোগের বিস্তার বন্ধ করা—রোগীদের থেকে নীরোগদের পৃথক ক'রে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা। কিন্তু সরকারের এই আইন জনসাধারণের ওপর খড়্গের মতো নেমে এলো। এই আইন হয়ে উঠলো প্লেগের থেকেও ভয়াবহ। এই আইন অনুসারে র‍্যাণ্ড সাহেব প্লেগ কমিশনার নিযুক্ত হয়ে এলেন। তাঁর হৃদয়হীন নির্বুদ্ধিতা বোম্বাই ও পুনায় বিভীষিকার স্বষ্টি করলো। রোগীদের থেকে নীরোগদের পৃথক করবার নামে, রোগ বিস্তার নিবারণের নামে, যে অরাজকতা শুরু হ'লো, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বিনা কারণে পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানকে, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে, পুত্রের কাছ থেকে বৃদ্ধ পিতামাতাকে নির্দয়ভাবে ছিনিয়ে অন্যত্র পাঠানো হ'তে লাগলো। বাড়ি তল্লাসির নামে গোরা সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে লুট-পাট চালাতে লাগালো। তারা অসংখ্য পরিবারের বাড়ির বিছানা ও আসবাবপত্র বিনা কারণে পুড়িয়ে দিতে লাগলো। স্ত্রীলোকদের নানাভাবে লাঞ্ছনা করতেও তারা কুণ্ঠিত হ'লো না। এইভাবে লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও অত্যাচারের যে তাণ্ডবলীলা সুরু হ'লো, তা দিনের পর দিন বিনা বাধায় চলতে লাগলো। পথে-ঘাটে মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠলো। তিলক এই সময়ে সরকারকে প্লেগ নিবারণ ও পৃথকীকরণের কাজে সাহায্য করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের এইসব হৃদয়হীন কার্যকলাপে তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। তিনি নিজে একটি হাসপাতাল খুললেন, "মারাঠা" ও "কেশরী" কাগজে প্রবন্ধ

লিখতে লাগলেন, লাট সাহেবর কাছে পত্র দিলেন। তিলক লিখলেন, "মনুষ্যরূপধারী যে মহামারী এখন নগরে রাজত্ব করছে, প্লেগের মহামারীও তার চেয়ে অনেক সহৃদয়।"

কিন্তু র‍্যাণ্ডের অমানুষিক কার্যকলাপ অবিরাম চলতে লাগলো। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ "টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া" তিলক সম্পর্কে বিষোদ্‌গার করতে লাগলো। তিলক যে বৃটিশ সাম্রাজের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, তাঁকে যে অবিলম্বে রাজদ্রোহী হিসাবে দণ্ডিত করা উচিত, এ রকম কথা লিখতেও তারা দ্বিধা করলো না। তিলকের বিরুদ্ধে ইংরেজদের তাঁবেদার কাগজগুলি অবিরাম প্রচারকার্য চালাতে লাগলো।

অবশেষে প্লেগ রোগও ক্ষান্তি দিলো না। ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্যে তিলক পুনা থেকে সিংহগড়ে গেলেন। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না, নিয়তি তাঁর জীবননাট্যের কী ভয়ংকর ও করুণ এক দৃশ্য অলক্ষ্যে রচনা করছেন!

দশ

তিলক তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বৃটিশ সরকারের স্বরূপ সম্পর্কে দেশবাসীকে ক্রমেই সচেতন ক'রে তুলছিলেন। গুরুভার রাজস্ব ও কর, জনসাধারণের দুর্বহ দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে সরকারের অব্যবস্থা ও অত্যাচার, এবং ভারতের এই দুর্দিনে রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী—এ সমস্ত বিষয়েই তাঁর লেখনী নির্ভীকভাবে মতামত প্রকাশ করছিল, যার ফলে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছিল এবং তিলককে তাদের

প্রধানতম শত্রু হিসাবে ধ'রে নিয়েছিল। 'টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি কাগজ তিলকের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল বিষোদ্গার করলেও সরকার তিলকের মতো একজন প্রতিষ্ঠাবান্ লোকের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে স্থির করতে পারছিল না। কিন্তু শীঘ্রই তাদের সুযোগ জুটলো।

দামোদর চাপেকর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর ছিলেন দুই ভাই। তাঁরা একটি সংঘ স্থাপন করেছিলেন। শারীরিক ও সামরিক শিক্ষাই ছিল এই সংঘের উদ্দেশ্য। এই সংঘের নাম ছিল "হিন্দু ধর্মের বাধা অপসারণ সংঘ।" দামোদর চাপেকর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর, দুজনেই গণপতি ও শিবাজী উৎসবের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁরা দেশমাতৃকার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। সেজন্যে প্রয়োজন হ'লে ইংরেজদের বধ করতেও তাঁদের কোনও দ্বিধা ছিল না।

তারিখ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২-এ জুন। ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীর উৎসব হচ্ছিল গভর্নমেণ্ট হাউসে। সেখানে র‍্যাণ্ড সাহেবও আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্লেগ কমিশনার হিসাবে র‍্যাণ্ড সাহেব যে হৃদয়হীনতা দেখিয়েছিলেন, সেজন্য সকল ভারতবাসীই তাঁকে ঘৃণার চক্ষে দেখত। চাপেকর ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। র‍্যাণ্ড সাহেব যখন জয়ন্তী উৎসব থেকে ফিরছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহকারী লুইস সাহেব এবং সস্ত্রীক লেফ্টেন্যাণ্ট এয়ার্স্ট। এয়ার্স্টকে মারবার উদ্দেশ্য ছিল না। চাপেকর ভাইয়েরা অন্ধকারে গুলী চালান। ফলে র‍্যাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে মারা যান এবং এয়ার্স্ট সাহেব সাংঘাতিক

ভাবে আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে এয়ার্স্টের মৃত্যু ঘটে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর এরকম ঘটনা আর ঘটে নি। ইংরেজরা ভারতে আবার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভীত হয়ে ওঠে। 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' ও 'বোম্বে গেজেটের' মতো কাগজগুলি এই অপরাধের জন্য তিলককেই বিশেষভাবে দায়ী করলো। তাঁর রচনা ও বক্তৃতার ফলেই ভারতবাসীরা এই পথে পা দিচ্ছে এবং সেজন্য তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত—এই মর্মে তারা প্রচারকার্য চালাতে লাগলো। দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁদের প্রাণদণ্ড হ'লো। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ শিক্ষিত যুবক। তাঁদের এই কাজে প্ররোচিত করবার জন্যে যে তিলককে দায়ী করা যায় না, একথা জানা সত্ত্বেও সরকার তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা আনলো। এ ব্যাপারে তারা তিলকের বিবিধ রচনা, বিশেষত শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁ হত্যা সম্পর্কে তাঁর ভাষণ এবং "শিবাজীর উক্তি" নামে কবিতাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলো। ২৭-এ জুলাই তারিখে তিলক বোম্বাইয়ে গিয়ে গিরগাঁওয়ে তাঁর এক বন্ধু দাজী আবাজী খারের বাড়িতে উঠেছিলেন। ঐ দিন রাত্রিতে দুই বন্ধু আহারাদি শেষ ক'রে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় পুলিস বাহিনী গিয়ে খারের বাড়ি ঘিরে ফেললো। একজন ইংরেজ পুলিস অফিসার তিলককে গ্রেফ্‌তার করলো। তারপর তাঁকে পুলিস কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো। পুলিস

কমিশনার তিলককে লক-আপে রাখতে হুকুম দিলেন। তিলকের মধ্যে কোনরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ঘণ্টা দুয়েক বাদে তাঁর বন্ধু খারে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে লক্-আপে গেলেন। কিন্তু গিয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, লক্-আপে তিলক গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তাঁর মুখে ভয়, উদ্‌বেগ বা দুশ্চিন্তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও নেই। এমনই নির্ভীক নির্বিকার মানুষ ছিলেন তিলক।

এগারো

তিলকের গ্রেফ্‌তারের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। তাদের প্রিয়তম নেতার প্রতি এই অত্যাচারে জনসাধারণ কীভাবে ক্রুদ্ধ ও উদ্‌বিগ্ন হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরদিন সকালে তিলকের কৌঁসুলী ডি. ডি. দাভার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিনের জন্য দরখাস্ত করলেন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিতে অস্বীকার করলে হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হ'লো। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতি পারসন্‌স্ ও বিচারপতি রানাডে জামিন মঞ্জুর করলেন না। তাঁরা বললেন, শীঘ্রই পুলিস তদন্ত শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং জামিনের প্রয়োজন নেই। পুলিস তদন্ত শেষ হ'তে এবং বিচার আরম্ভ হ'তে দেরী আছে দেখে আবার হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হ'লো। এবারও বিচাপতি পারস্‌ন্‌স্ ও রানাডে জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করলেন। বিচারের শুনানী আরম্ভ হ'তে যথেষ্ট দেরি হওয়ায় আবার হাইকোর্টে জামিনের

জন্যে আবেদন করা হ'লো। এবারে সৌভাগ্যবশত আবেদন বিচারপতি বদরুদ্দিন তায়েবজীর এজলাসে উঠলো। তায়েবজী জামিন মঞ্জুর করলেন। সে সময়ে কোনও বিচারপতির পক্ষে এই কাজ করা খুবই দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। তিলক ৫০০০০ টাকার জামিনে খালাস পেলেন। সারা দেশ তায়েবজীকে আশীর্বাদ করতে লাগলো। তায়েবজী যখন আদালত থেকে বাড়ী ফিরতেন, তখন সসম্ভ্রমে লোকে অঙ্গুলি-সংকেত ক'রে তাঁকে দেখাতো—"ঐ বিচারপতি তায়েবজী যাচ্ছেন—যিনি তিলককে জামিনে খালাস দিতে দুঃসাহস করেছিলেন।"

এ থেকেই বোঝা যায়, সেদিনের আদালত কেমন ছিল। রানাডের মতো একজন বিচারপতিও সরকারের অভিরুচির বিরুদ্ধে যেতে সাহস করতেন না। এমনি এক আদালতে শুরু হ'লো তিলকের বিচার। বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হ'লে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্যন্ত হ'তে পারে। ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাসে এই ধরনের রাজদ্রোহের বিচার এর আগে মাত্র আর একবার হয়েছিল—কলিকাতায়, "বঙ্গবাসী" কাগজের বিরুদ্ধে। তাই এই বিচার সম্পর্কে সকলেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে রইলো।

বোম্বাই হাইকোর্টে বিচারপতি স্ট্র্যাচির এজলাসে ৮ই সেপ্টেম্বর মামলার শুনানী শুরু হ'লো। সরকারের পক্ষে আইনজীবীদের নেতৃত্ব করলেন অ্যাডভোকেট ল্যাং। তিলকের পক্ষেও বিখ্যাত আইনজীবীর অভাব হ'লো না। দাভার,

ভাইশংকর ও কঙ্গ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরা তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন। তখনকার দিনে কলিকাতার বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন পাগ্। ক্যালকাটা ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি তাঁকে এই মামলা চালাবার জন্যে পাঠালেন। ন'জন নিয়ে বিশেষ জুরী গঠিত হ'লো। জুরীতে ছ'জন ইংরেজ, দু'জন হিন্দু ও একজন পার্শী ছিলেন। ১৪-ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি রায় দিলেন। তিলককে জুরীর ছ'জন ইংরেজ দোষী ও তিনজন ভারতীয় নির্দোষ ঘোষণা করলেন। বিচারপতি ছয় জনের মতকেই গ্রাহ্য ক'রে তিলককে দেড় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আইনত এই অপরাধের জন্য তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়ার কথা। বিচারপতি বললেন, তিলকের জনহিতকর কার্য ও সরকারের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা স্মরণ ক'রে তিনি দণ্ডকাল কমিয়ে অর্ধেক করেছেন।

দেশের সর্বত্র, খবরের কাগজের অফিসে ও টেলিগ্রাফ অফিসে, মানুষ দলে দলে জমায়েত হয়ে সংবাদের জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিল। তিলক দণ্ডিত হওয়ার সংবাদে সারা দেশে গভীর বেদনার ছায়াপাত হ'লো। তিলক যে নির্দোষ, একথা দেশবাসী মাত্রেই বিশ্বাস করতো। তাই এ যে বিচারের নামে অত্যাচার হয়েছে, এই ধারণাই দেশময় ছড়িয়ে পড়লো।

পরদিন সমস্ত দেশীয় কাগজগুলি কালো বর্ডার দিয়ে ছাপা হ'লো। মাদ্রাজের "হিন্দু" কাগজ পাঠকদের কাছে শুধু তিলকের ছবি দিয়ে সাদা কাগজ পাঠাবার প্রস্তাব করলো। কলেজের ছাত্ররা কালো ফিতে হাতে বেঁধে কলেজে গেল। বোম্বাইয়ের

বিখ্যাত দশেরা উৎসব বন্ধ রাখা হ'লো। বোম্বাইয়ে বহু বাড়িতে তিলকের ছবি পূজা করা হ'তে লাগলো। তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হয়ে ভারতের জনচিত্তে যে আসন পেলেন, তা এর আগে আর কেউ পান নি—পরেও খুব অল্প লোকই পেয়েছেন!

স্ট্র্যাচির রায় দানের তিন দিন বাদে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করবার অনুমতি চেয়ে তিলকের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আবেদন করা হ'লো। হাইকোর্ট এই আবেদন অগ্রাহ্য করলো।

হাইকোর্ট যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অভিরুচি মতো এই কাজ করেছে এবং ন্যায় বিচারের পথে অগ্রসর হয়নি, সে কথা বহু বিখ্যাত আইনজীবীও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলেন। এমন কি "স্টেট্স্ম্যান" পত্রিকাও হাইকোর্টের এই কাজের নিন্দা করলো। দেশে নানা স্থানে সভা-সমিতি ক'রে এই অবিচারের প্রতিবাদ জানানো হ'লো। তিলকের রচনা ও বক্তৃতা যা করতে পারে নি, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অভিরুচি অনুসারে চালিত আদালত তা-ই করলো। দেশময় প্রবল অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্যে বিজয়ী বীরের মতো তিলক সেদিন কারাগারে প্রবেশ করলেন।

জেলে তাঁকে সাধারণ আসামীদের সঙ্গে রাখা হ'লো। তাঁকে সাধারণ শ্রমিকের মতো কাজ করতে হ'তো। পুরানো দড়ির পাক খুলে শন বার করবার কাজ ছিল তাঁর। অত্যন্ত সাধারণ খাদ্য দেওয়া হ'তো তাঁকে, যা জীবনে তিনি কখনও খান নি। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর ওজন ৩১ পাউণ্ড ক'মে গেল।

তিলকের কারাদণ্ড হবার পরেও তাঁর বন্ধু ও ভক্তরা নীরব রইলেন না। তাঁদের চেষ্টায় সরকার তিলককে বাইকুলার হাউস অব করেক্‌শ্যনে স্থানান্তরিত করলো। কিন্তু সেখানেও তাঁর প্রতি ব্যবহার বা তাঁর খাদ্যের বিশেষ উন্নতি হ'লো না। তিলকের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগলো। তাঁর বহুমূত্র রোগ দেখা দিল।

তিলকের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির সংবাদ কেবল ভারতেই উদ্‌বেগের সঞ্চার করলো না। ইউরোপেও তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুর অভাব ছিল না। তাঁরাও তিলকের জন্য আন্দোলন করতে লাগলেন। জেলে বন্দীদের উপর যাতে ভালো ব্যবহার করা হয়, সেজন্যে চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে হাওয়ার্ড এসোশিয়েন নামে একটি সংঘ ছিল ইংলণ্ডে। হাওয়ার্ড সংঘ ভারত সচিবকে জানালো, তিলক একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁকে সাধারণ আসামীর পর্যায়ে ফেলা অন্যায়। কেবল তাই নয়, তিলককে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি সাধারণ আসামীর মতো ব্যবহার করা আইনবিরুদ্ধ। হাওয়ার্ড সংঘের চেষ্টায় বৃটিশ সরকার তিলককে বোম্বাই থেকে অবশেষে যারবেদা জেলে স্থানান্তরিত করলো। তাঁর প্রতি ব্যবহার ও তাঁর খাদ্যের কিছুটা উন্নতিও হ'লো।

এতেও তিলকের বন্ধুরা ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা তাঁর মুক্তির জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগলেন। ম্যাক্‌স্ মুলার, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার, স্যার রিচার্ড গার্থ, উইলিয়াম কেইন প্রভৃতি বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তিলককে অবিলম্বে মুক্তি

দেওয়ার জন্য ভারত সচিবের কাছে আবেদন পাঠালেন। তিলকের আসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। ম্যাক্স্ মুলার ঐ সময়ে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "ঋগ্‌বেদ" রচনা করেছিলেন। বৈদিক শাস্ত্রে তিলকের গভীর জ্ঞান সম্পর্কে ম্যাক্স্ মুলারের খুবই উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি জেলেই তিলকের কাছে তাঁর ঋগ্‌বেদের এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

তিলকক মুক্তি দেওয়ার জন্যে চারিদিকে যে রকম আন্দোলন চলছিল, তাতে বৃটিশ সরকার মাথা নত না ক'রে পারলো না। তারা তিলককে অপমানজনক শর্তে মুক্তি দিতে রাজী হ'লো। তারা বললো, তিলক আর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন না, তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কিন্তু তিলক তাতে রাজী হলেন না। তিলকের দণ্ডকালের এক বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল। আর বাকী ছিল ছ' মাস। অবশেষে উভয় পক্ষের অলোচনার পর স্থির হ'লো, তিলক পরে যদি কখনো এই অপরাধে দণ্ডিত হন, তখন এই বাকী ছ'মাস তাঁকে অতিরিক্ত কারাভোগ করতে হবে।

এই চুক্তি অনুসারে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ন'টায় তিলককে মুক্তি দেওয়া হ'লো। তাঁর মুক্তির সংবাদ তারযোগে গভীর রাতে পুনায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু তিলকের জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে, সেই গভীর রাতেও দলে দলে লোক বিছানা ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো। বিপুল জনতার জয়ধ্বনিতে তিলকের গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হ'লো। পরদিন (৭ই সেপ্টেম্বর) সারা পুনায় আনন্দ উৎসব শুরু হ'লো। আলোকে, গীতে, বাদ্যে

মন্দির, গৃহ ও পথগুলি উজ্জ্বল, মুখর ও চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিলকের মাল্যভূষিত ছবি চারিদিকে শোভা পেতে লাগলো।

রাত একটার সময় তিলকের মুক্তিলাভের সংবাদ গিয়ে পৌঁছেছিল বোম্বাইয়ে। সেখানেও গভীর রাত থেকে আনন্দ-উৎসব শুরু হ'লো। ভারতের অন্যান্য শহরগুলিও বাদ গেল না। তিলক জাতির অদ্বিতীয় নেতারূপে সেদিন দেখা দিলেন।

বারো

কারামুক্ত হয়ে তিলক কিছুদিন সিংহগড়ে বিশ্রামের জন্য গেলেন। তাঁর স্বাস্থের অবস্থা খুবই খারাপ থাকায় বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও বেশীদিন তাঁর পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব ছিল না। ঐ বৎসর মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। তিলক ঐ অধিবেশনে যোগদানের জন্য গেলেন। প্রত্যেকটি স্টেশনে তাঁকে জনসাধারণ বিপুল উৎসাহ ভরে অভ্যর্থনা জানালো। মাদ্রাজ থেকে তিলক গেলেন মাদুরা, মাদুরা থেকে রামেশ্বর, রামেশ্বর থেকে সিংহল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর আবার ফিরে এলেন পুনায়।

এই সময়টা কয়েক মাস তিনি খুবই নীরব ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধ দল এই ব'লে প্রচার করছিল যে, তিলক সরকারের কাছে খুব অপমানজনক শর্তে মুক্তি পেয়েছেন, তাই তিনি এখন চুপচাপ আছেন। আসলে ব্যাপারটা তা ছিল না। তাঁর শরীর খুবই দুর্বল ছিল। তিনি কোনও কিছু বললে তা নিয়ে

যে সরকারের সমর্থক কাগজ ও দলগুলি নানারকম অপব্যাখ্যা শুরু করবে, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। অথচ তাঁর স্বাস্থ্যের যেরকম অবস্থা, তাতে উপযুক্ত প্রতিবাদ জানানোও যে সম্ভব হবে না, তা তিলক জানতেন। তাই তিনি কিছুদিন নীরব ছিলেন।

তিলক পুনায় যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর শরীর অনেকখানি সেরে উঠেছিল। তাই এবার তাঁর নীরবতা ভঙ্গ হ'লো। জুলাই মাসের গোড়ার দিক থেকেই তিনি কেশরীর সম্পাদনার ভার নিলেন এবং তাঁর নামে প্রবন্ধাদি বেরুতে লাগল। সার্বজনিক সভা তিলকপন্থীদের হস্তগত হওয়ায় নরমপন্থীরা তিলকের সঙ্গে সহযোগিতা ত্যাগ করেছিলেন। তিলক তাই নরমপন্থীদের উদ্দেশে আবেদন জানালেন—এখন নিজেদের মধ্যে বিবাদের সময় নয়, আমাদের বিবাদ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। কিন্তু নরমপন্থীরা তিলকের কথায় কর্ণপাত করলেন না। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে তাঁদের প্রকৃত কোনও বিরোধ ছিল না। ইংরেজ সরকারের দরজায় ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছু তাঁরা বুঝতেন না। এই ছিল তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পন্থা। তাই রাজদ্রোহ ছিল তাঁদের কাছে ঘৃণ্য অপরাধ, তাই তিলককে তাঁরা খুনী আসামীর মতো ঘৃণা করতেন। বৃটিশ সরকারের মতো তাঁরাও মনে করতেন, র‍্যাণ্ড ও এয়ার্স্ট্ সাহেবের হত্যার জন্যে মূলত তিলকই দায়ী। গণপতি উৎসব ও সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম সমালোচনা মারাঠীদের মনে যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তাতেই র‍্যাণ্ড ও এয়ার্স্ট্

প্রথম আহুতি হয়েছিল। সুতরাং নরমপন্থীরা তিলকপন্থীদের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক না রাখাই নিরাপদ মনে করলেন। এইভাবে নরমপন্থীদের সঙ্গে তিলকপন্থীদের বিভেদ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। পর বৎসর (১৮৯৯) লখ্‌নৌ কংগ্রেসে তিলক যখন বোম্বাইয়ের গভর্নর স্যাণ্ডহার্স্টের শাসনকার্যের সমালোচনা ক'রে প্রস্তাব আনলেন, তখন নরমপন্থীরা সে প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিলেন না।

কংগ্রেসের এই নীতির সঙ্গে জাগ্রত জনমতের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। তাই নরমপন্থীদের নেতৃত্বে কংগ্রেস আরাম-চেয়ারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছুটির সম্মেলনে পরিণত হয়েছিল। বৃটিশ সরকারও তা জানতো। সেজন্য কংগ্রেসের দাবীকে তারা শিক্ষিতদের দাবী ব'লে উড়িয়ে দিতো। তাই তিলক কংগ্রেসে যোগদানের সময় থেকেই কংগ্রেসকে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেষ্টা করছিলেন। নরমপন্থীরা ছিলেন সে পথে প্রধান বাধা। তাই তিলকের সঙ্গে নরমপন্থীদের বিবাদ ও অবশেষে বিচ্ছেদ ছিল অনিবার্য। এ বিষয়ে তিলক নিঃসঙ্গ ছিলেন না। বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লজপৎ রায় ও অরবিন্দ ঘোষের মতো নেতারাও তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। কংগ্রেসে নরমপন্থীদের প্রাধান্য থাকলেও তিলক প্রভৃতি বিরোধী নেতাদের পেছনে দেশের জনসাধারণ যে রয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। জনসাধারণ জানতো, তিলক তাঁদের নেতা। আর তিলক জানতেন, জনসাধারণই তাঁর শক্তি।

তেরো

বাল্যকালে গণৎকার তিলকের কোষ্ঠী বিচার ক'রে যেসব ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছিল। তবে একটি বিষয় সত্য হয়েছিল। সেটি হ'লো তিলককে বহু মামলা-মোকদ্দমা করতে হবে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিলক আবার এক মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। মামলাটি রাজনৈতিক বিষয়ে ছিল না; তাই এতে তিলকের অর্থ ও শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যে বাবা মহারাজ নামে এক বড় জমিদার ছিলেন। বাবা মহারাজের দু'টি মেয়ে ছিল, কিন্তু কোনো ছেলে ছিল না। তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। সুতরাং পুত্র হওয়ার আশা ছিল। কিন্তু এই সময় বাবা মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা গেল। তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিলক। তাই বাবা মহারাজ একটি উইল ক'রে তিলক ও অপর তিন ব্যক্তিকে সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করলেন। অছিদের উপর এই ভারও থাকে যে, যদি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সকোয়ারবাঈ (তাই মহারাজ) কন্যা সন্তান প্রসব করেন, তবে অছিরা তাঁর জন্যে একটি দত্তক মনোনীত ক'রে দেবেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে বাবা মহারাজের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পদিন বাদে তাঁর বিধবা পত্নী সকোয়ারবাঈয়ের একটি পুত্র জন্মে। কিন্তু দু' মাস বাদেই ঐ পুত্রের মৃত্যু ঘটে।

ইতিমধ্যে রাজদ্রোহের অপরাধে তিলকের কারাদণ্ড হয়েছিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন বাদে শুনলেন যে, সকোয়ারবাঈয়ের ক্ষয়রোগ হয়েছে। তাই অছিরা এখন একজন দত্তক মনোনীত করাই উচিত মনে করলেন। তাঁরা নিজাম রাজ্যের একটি বালককে দত্তক মনোনীত করলেন। ফলে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জগন্নাথ নামে একটি বালককে সকোয়ারবাঈ দত্তকরূপে গ্রহণ করলেন। দত্তক গ্রহণের সংবাদ পুনায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো।

ইতিমধ্যে নাগপুরকর নামে অছিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সকোয়ারবাঈকে এই দত্তক বাতিল ক'রে অন্য দত্তক গ্রহণের পরামর্শ দিলো। তিলক যে দত্তক মনোনীত করেছিলেন, সে ছিল নাবলক। বাবা মহারাজের অনেক দেনা ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী নাবালক হ'লে ঐ ঋণ শোধ করবার জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যাবে, এই আশায় তিলক একজন নাবালক দত্তক গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতে সকোয়ারবাঈয়ের বেশ অসুবিধা ছিল। কারণ, ঐ সুদীর্ঘকাল তাঁকে অছিদের অধীনে থাকতে হ'তো। তাই নাগপুরকর তাঁকে একটি বয়স্ক বালককে দত্তক গ্রহণ করতে বললেন। স্থির হ'লো, নূতন দত্তক সকোয়ারবাঈকে তাঁর জীবদ্দশায় মাসিক ২০০৲ টাকা ক'রে মাসোয়ারা দেবে। সকোয়ারবাঈ ছিলেন বাবা মহারাজের দ্বিতীয়া পত্নী; পুলিসের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাঁর স্বভাব-চরিত্রও ভালো ছিল না। তাই নাগপুরকরের এই ব্যবস্থা তাঁর কাছে খুব লোভনীয় মনে হ'লো।

সকোয়ারবাঈ পূর্বগৃহীত দত্তককে বাতিল ক'রে নূতন দত্তক গ্রহণ করলেন। কেবল তাই নয়, সে ও তাঁর কুচক্রী পরামর্শ-দাতারা তিলকের নামে বিশ্বাসভঙ্গ এবং সকোয়ারবাঈ ও নাগপুরকরকে বেআইনীভাবে তিন দিন আটক রাখবার অভিযোগ আনলো।

অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। কিন্তু তিলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ! এই রকম একটা বিশ্রী মামলায় তিলককে আসামী ক'রে জড়াতে পারলে যে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করা যাবে, সরকার তা ভালো ক'রেই জানতো। তাই তারা এই সুবর্ণ-সুযোগ ছাড়লো না। সরকারই এই মামলা চালাবার ভার নিজের হাতে নিলো।

এই মামলা তিন বৎসর ধ'রে চললো। বোম্বাই সরকার ষাট সত্তর হাজার ব্যয় করলো। কিন্তু হাইকোর্টে তিলকেরই জয় হ'লো।

এই মামলায় সরকারের অত্যুৎসাহ সকলের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। এ যে তিলককে জব্দ করবার একটি চক্রান্ত মাত্র, হাইকোর্টের রায়ে তাই সুপ্রমাণিত হ'লো। কিন্তু সরকারের এতে কিছু লাভও হ'লো। এই তিন বৎসর তিলক মামলায় ব্যস্ত থাকায় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারলেন না। তাঁর আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক ক্ষতিও কম হ'লো না।

চৌদ্দ

যখন তিলক জেলে ছিলেন, তখন বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্ মুলার তাঁর নবপ্রকাশিত ঋগ্‌বেদ বইখানি তিলকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জেলে ঐ বইখানি পড়বার সময়ে আর্যদের আদিবাসস্থান সম্পর্কে একটি অভিনব ধারণা তাঁর মনে দানা বেঁধে ওঠে। তিনি ঋগ্‌বেদে এমন কতকগুলি জ্যোতিষ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ পান, যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেন যে, ভারতীয় আর্যগণের আদিবাসস্থান ছিল সুমেরু অঞ্চলে। যেমন, দেবতাদের দিন ও রাত হ'লো মানুষের এক বৎসর। সুমেরু অঞ্চলে দিন ছয় মাস ও রাত ছয় মাস। সুতরাং এর মধ্যে সুমেরুর অতীত স্মৃতি বর্তমান রয়েছে, এমন অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। তিলকের "ওরিয়ন" বা "মৃগশীর্ষ" পুস্তকখানি প্রকাশিত হ'লে পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মহলে যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, এই বইখানিও তেমনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। বইখানির নাম "দি আর্কটিক হোম ইন্ দি বেদস্"। তিলক বইখানি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রচনা করলেও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি তিনি পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের দ্বারা যাচাই ক'রে নেওয়ার জন্য কয়েক বছর অপেক্ষা করেছিলেন। ঐ সকল বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে তাঁর অনুমানের কোনো অসামঞ্জস্য ছিল না। ভূতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব থেকে জানা গেছে, গত কয়েক লক্ষ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কয়েকটি হিম যুগ ও উষ্ণ যুগ এসেছে। তা যদি সত্য হয়, তবে এই অনুমান করা

যেতে পারে যে, শেষ হিম যুগের আগে উষ্ণ যুগে সুমেরু অঞ্চল মনুষ্যবাসের উপযুক্ত ছিল। অতঃপর হিম যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুমেরু অঞ্চলের ঐ মানুষরা ক্রমেই দক্ষিণে চ'লে আসেন। হাজার হাজার বছর ধ'রে এগোবার পরে অবশেষে তাঁরা ইরান ও ভারতে এসে উপস্থিত হন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিলক তাঁর এই চাঞ্চল্যকর বইখানি প্রকাশ করলেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি ইউরোপীয় ও মার্কিন প্রাচ্যবিদ্‌দের আবার স্তম্ভিত করলো।

পনেরো

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কারারুদ্ধ হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিলকের তৎপরতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। সকোয়ার-বায়ের মামলায় তাঁর দীর্ঘ তিন বৎসর কেটেছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন যখন বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন বাংলাদেশে যে বিক্ষোভের সূত্রপাত হ'লো, তার তরঙ্গ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো এবং তিলক আবার নবোদ্যমে রাজনীতিতে পদার্পণ করলেন। লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী ব'লে গালি দিয়েছিলেন। ভারতবাসী এই অপমান নীরবে সহ্য করলো না। ঐ সময় মহারাষ্ট্রে নানা ফড়নবীশের যে স্মৃতিদিবস পালিত হ'লো, তার বহু সভায় তিলক সভাপতিত্ব করলেন। তিলক বললেন, "আজ লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দিচ্ছেন। কিন্তু ইংরেজদের সম্পর্কে নানা ফড়নবীশের মতামতও ঠিক ঐ রকম ছিল।

নানা ফড়নবীশ মহাদাজী সিন্ধিয়াকে যেসব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলিতে তিনি ধূর্ত ইংরেজদের সম্পর্কে সতর্ক হ'তে উপদেশ দিয়েছিলেন।"

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সবিনয় আবেদন-নিবেদন বা বাদ-প্রতিবাদ ক'রেই ক্ষান্ত ছিল না। এতোদিন যেসব আন্দোলন ভারতবর্ষে হয়েছিল, সেগুলিতে ইংরেজদের কোনও-রকম আর্থিক ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এবার বাংলাদেশ ইংরেজদের পকেটে হাত দিলো। শুরু হ'লো স্বদেশী আন্দোলন। দেশীয় দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জন হ'লো এই আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র। বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। মহারাষ্ট্রও বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হয়ে উঠলো। এই আন্দোলনের নায়করূপে দেখা দিলেন তিলক স্বয়ং। তিনি "মারাঠা" ও "কেশরী" পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় স্বদেশী আন্দোলন ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনের উপযোগিতার কথা প্রচার করতে লাগলেন। মহারাষ্ট্রে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য নূতন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠলো। ছাত্ররা দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিল। স্কুল-কলেজে প্রায়ই হরতাল হ'তে লাগলো। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিলকের নেতৃত্বে "পয়সা ফাণ্ড" নামে একটি তহবিল খোলা হ'লো। তিলক এই ফাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন, "যদি প্রত্যেক ভারতবাসী বছরে এই তহবিলে একটি ক'রে পয়সা দেয়, তা হ'লে প্রতি বৎসর ছ'-সাত লাখ টাকা উঠবে। এই টাকা দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির

জন্য ব্যয়িত হ'তে পারবে। এই টাকায় ছাত্রদের ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে পাঠিয়ে শিল্পকর্মে শিক্ষিত ক'রে আনা যাবে।" তিলক গণপতি উৎসবকেও স্বদেশী আন্দোলনের কাজে ব্যবহার করতে লাগলেন। পুনায় গণপতি উৎসবে ভারতীয় ও জাপানী জিনিসের প্রশংসা ক'রে বহু গান রচিত ও গীত হ'লো। তিলক বললেন, "ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে। ভারতীয় জিনিস না পাওয়া গেলে আমরা জাপানী জিনিস ব্যবহার করবো। তাও না পাওয়া গেলে জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া বা আমেরিকা, যে কোনও দেশের জিনিস ব্যবহার করব—কেবল ইংলণ্ড ছাড়া।"

তিলক বাংলাদেশ থেকে মহারাষ্ট্রে স্বদেশী আন্দোলন আমদানী করলেন। আর বাংলাদেশ মহারাষ্ট্র থেকে আমদানী করলো "শিবাজী উৎসব"। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী উৎসবে অংশ-গ্রহণের জন্য তিলক সদলবলে কলিকাতায় আমন্ত্রিত হয়ে এলেন। তিলককে বাংলাদেশ সেদিন যেভাবে অভ্যর্থনা করলো, প্রীতি ও ও শ্রদ্ধা দেখালো, তার তুলনা মেলে না। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হ'লো। তিলক ও তাঁর সহচরদের গাড়িগুলি তরুণ বাঙ্গালী ছাত্ররা টেনে নিয়ে চললো। পুণ্য গঙ্গাজলে বাঙ্গালী তিলকের অভিষেক করলো। এইভাবে বাংলাদেশ সেদিন তিলককে, কেবল মহারাষ্ট্রের নয়, সারা বাংলার তথা সারা ভারতের অবিসংবাদী নেতরূপে গ্রহণ করলো।

কলিকাতা থেকে ফেরবার পথে তিলক নাগপুরে গিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হ'লো। তা

দেখে তৎকালীন তিলক-বিরোধী একটি পত্রিকা, "জাম-ই জামশেদ" লেখেছিল—"তিলককে লোকে দেবতার মতো পূজা করছে।" তাদের এই মন্তব্য ঈর্ষাপ্রণোদিত হ'লেও মিথ্যা ছিল না।

ষোলো

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে তিলক ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে চাইলেন। তিনি বয়কটের অর্থ করলেন, কেবল বিলাতী দ্রব্য বর্জন নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা। ইংরেজরা এ দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, নরমপন্থী নেতারা সেজন্যে গদগদচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কিন্তু তিলক বললেন, ইংরেজরা এ দেশে যে শিক্ষার প্রবর্তন করেছে, তাতে জাতির মেরুদণ্ড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; কেবল লিখতে ও পড়তে জানাই প্রকৃত শিক্ষা নয়, বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভই শিক্ষা। সকল স্বাধীন দেশের পাঠ্যপুস্তকেই দেশ-প্রেমের কাহিনী থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকে তা অচল। কিম্বা ধরুন, দেশের আমদানি-রপ্তানির কথা। দু' কোটি টাকা কেবল চিনির জন্যে বাইরে চ'লে যাচ্ছে। এ কথা কি কোনও পাঠ্য পুস্তকে লেখা থাকে? প্রতি বছর তিরিশ চল্লিশ কোটি টাকা আমাদের দেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে চলে যাচ্ছে। আর ঐ টাকা আমাদের কোনও উপকারে লাগছে না। সে কথা কি কোন পাঠ্য পুস্তকে লেখা থাকে? তাই দেশকে জাগ্রত করতে হ'লে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা

চাই, যার দ্বারা দেশের মানুষ নিজেদের প্রকৃত অবস্থার কথা বুঝতে পারবে।

তিলক বললেন, এই উদ্দেশ্যে দেশে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে, নিজেদের চেষ্টায় গ'ড়ে তুলতে হবে অসংখ্য স্কুল-কলেজ। এজন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা দরকার। জাতীয় শিক্ষার এই সুবৃহৎ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার দায়িত্ব কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু কংগ্রেসে ঐ সময় নরমপন্থীদের প্রাধান্য থাকায় তাঁরা এই পথে অগ্রসর হ'তে চাইলেন না। তাই তিলক ও তাঁর সহকর্মীরাই নিজেদের চেষ্টায় বহু জাতীয় বিদ্যালয় গ'ড়ে তুললেন।

তিলক ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, মাতৃভাষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান বাহন হবে এবং ইংরেজী ভাষা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে। তিনি একটি সর্বভারতীয় ভাষার কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। বললেন, "সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হ'লে একটি জাতীয় ভাষারও প্রয়োজন।" তিনি হিন্দীকেই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযোগী মনে করলেন। ভারতীয় সমস্ত ভাষাগুলির জন্যই তিনি দেবনাগরী হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেন।

তিলকের এই জাতীয়তাবাদ নরমপন্থীদের ভীত ক'রে তুললো। ইংরেজ সরকারও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তাই ইংরেজ সরকার ও নরমপন্থী কংগ্রেসীরা, সবারই এখন কাম্য হয়ে উঠলো তিলকের পতন। এরা উভয়েই তিলকের বিরুদ্ধে মিলিত অভিযান চালাতে লাগলো।

সতেরো

বাংলা ও মহারাষ্ট্রে যে জাতীয় জাগরণ ঘটেছিল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নরমপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছিল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে বাংলার জাতীয় জাগরণ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে মৌখিক প্রশংসা করা হ'লেও তাকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রূপ দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করা হ'লো না। তিলক ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসের এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। ঐ বছর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ সস্ত্রীক ভারতে এসেছিলেন। তাঁকে বিনীত ও অনুগত চিত্তে অভ্যর্থনা জানাবার প্রস্তাব আনলেন নরমপন্থীরা। তিলক এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে সদলে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। কংগ্রেস যতোদিন নরমপন্থীদের কুক্ষিগত থাকবে, ততোদিন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে গ'ড়ে তোলা যে সম্ভব হবে না, তিলক ও তাঁর অনুগামীরা বুঝলেন। কংগ্রেস ত্যাগ করাও তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। তাই কংগ্রেসের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী বা নেশন্যালিস্ট নামে একটি দল তাঁরা গ'ড়ে তুললেন। কংগ্রেস শিবিরেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য ঐ দলের প্রকাশ্য অধিবেশন হ'লো। তাঁরা ঐ সভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, ইংরেজদের কাছে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে তাঁরা ধর্ণা দেবেন না। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও অসহযোগিতার দ্বারাই তাঁরা বৃটিশ সরকারকে জনমত মানতে বাধ্য করাবেন।

কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনের পর তিলক ও বিপিনচন্দ্র

পাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এক বৎসর তাঁরা অক্লান্ত চেষ্টায় জাতীয় দলকে যথেষ্ট শক্তিশালী ক'রে তুললেন। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় দলের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু কংগ্রেসে তখনো নরমপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্য নষ্ট করবার জন্য জাতীয় দল এ বৎসর (১৯০৬) কংগ্রেস অধিবেশনে তিলককে সভাপতি করতে চাইলো। এই বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। সেখানে তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের সমর্থকসংখ্যা যে বেশী হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই তিলক যাতে এ বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি হ'তে না পারেন, নরমপন্থী দল সে চেষ্টা করতে লাগলো। ঐ সময় বৃদ্ধ দাদাভাই নওরোজী ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁকে এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য নরমপন্থীরা আমন্ত্রণ ক'রে আনলো। তারা ভাল ক'রেই জানতো, তিলক নওরোজীকে পিতার মতো ভক্তি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে তিলক কখনো সভাপতির পদপার্থী হবেন না। ফলে দাদাভাই নওরোজী ঐ বৎসর কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন।

কিন্তু নরমপন্থীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'লো না। জনমতের চাপে দাদাভাইও চরমপন্থীদের প্রস্তাবগুলি পাস করতে বাধ্য হলেন। স্বরাজ কংগ্রেসের লক্ষ্য ব'লে ঘোষিত হ'লো। এর আগে কোনও কংগ্রেস সভাপতি তাঁর ভাষণে "স্বরাজ" কথাটি ব্যবহার করেন নি। কংগ্রেস স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন সমর্থন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

দাদাভাই নওরোজী সভাপতির অভিভাষণে বললেন, "এতোদিনে কংগ্রেস সাবালক হ'লো।"

আঠারো

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জাতীয় দলেরই জয় হ'লো। ফলে নরমপন্থীদল ও ইংরেজ সরকার, উভয়েই এই দলের প্রভাব বিনাশের জন্য পাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব আনবার কথা নরমপন্থীরা ভাবলো। কিন্তু এই ধরনের কোনও চক্রান্ত যাতে কার্যকরী হ'তে না পারে, তিলক তার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হলেন।

ঐ বৎসর (১৯০৭) নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনে জাতীয় দল এ বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্য তিলকের নাম প্রস্তাব করলো। এর প্রতিবাদে নরমপন্থী দল প্রস্তাব করলো ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নাম। বহু বাদ-বিতণ্ডার পরও এ বিষয়ে কোনও মীমাংসা হ'লো না। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে নরমপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। তারা হঠাৎ কংগ্রেসের এই বৎসরের অধিবেশন নাগপুরে না ক'রে সুরাটে করবার কথা স্থির করলো। কারণ নাগপুর ছিল চরমপন্থীদের অন্যতম ঘাঁটি; আর সুরাটে ছিল নরমপন্থীদের প্রাধান্য। কিন্তু সুরাটেও অভ্যর্থনা সমিতির সভায় আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বিবাদ বাধলো। এবার জাতীয় দল কংগ্রেসের সভাপতির জন্য লালা

লজপত রায়ের নাম প্রস্তাব করলো। সুরাটে অভ্যর্থনা সমিতিতে নরমপন্থীদের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা থাকায় গোখেল বিনা আলোচনায় জাতীয় দলের প্রস্তাব বাতিল ক'রে দিলেন। নরমপন্থী দলের সভাপতি মনোনিত হওয়ার অর্থ যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ত্যাগ করা, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। জাতীয় দল এই ব্যাপার নীরবে সহ্য করলো না। বিভেদ দৃষ্টি হয়, তিলক তা চাইতেন না। কিন্তু এ-ও চাইতেন না যে, নরমপন্থীদের নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় জাগরণের অন্তরায় হয়। ২৩-এ ডিসেম্বর রবিবার তিলক সুরাটে পৌঁছলেন। পরদিন অরবিন্দ ঘোষর (পরবর্তী কালে শ্রীঅরবিন্দ) সভাপতিত্বে সুরাটে জাতীয় দলের প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধির একটি সভা অনুষ্ঠিত হ'লো। তাতে প্রস্তাব করা হ'লো যে, সকল বিষয় ভোটাভোটিতে গ্রহণ বা বাতিল করতে হবে, এমন কি সভাপতির নির্বাচনও।

কিন্তু নরমপন্থীরা জাতীয় দলের কোনও প্রস্তাবই গ্রহণ করলো না। কংগ্রেসের ঐক্যও তাদের কাম্য ব'লে মনে হ'লো না। তাদের কার্যকলাপে মনে হ'তে লাগলো, স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ ক'রে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের অনেককে সরিয়ে তাদের স্থলে ভাড়াটে গুণ্ডা পর্যন্ত আমদানী করলো। বিনা ভোটাভোটিতে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এর প্রতিবাদে তিলক মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর ওপর বল-প্রয়োগ করা হ'লো। এইভাবে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিবাদ চরমে গিয়ে পৌঁছলো। সভামণ্ডপ ছোটখাটো রণক্ষেত্রে

পরিণত হ'লো, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে লাগলো। কংগ্রেসের এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য নরমপন্থীদের বৃটিশ তোষণ ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল দায়ী।

এইভাবে জাতীয় জীবনের এই সংকট মুহূর্তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশতি অধিবেশন সমাপ্ত হ'লো। কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে দু'টি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে গেলো।

উনিশ

সুরাট অধিবেশন এইভাবে শেষ হওয়ার জন্য নরমপন্থীরা তিলককেই দায়ী করলো। নরমপন্থী কাগজগুলি এক সুরে চেঁচাতে লাগলো, তিলক জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করেছেন, তিলক দেশের শত্রু। কিন্তু নরমপন্থীরা যাই বলুক, সারা মহারাষ্ট্র যে তাঁর পেছনে আছে, তিলক তা ভালো ক'রেই জানতেন। কেবল মহারাষ্ট্র নয়, বাংলাদেশও এই বিপ্লবী নেতাকে তার পূর্ণ সমর্থন জানালো।

নরমপন্থী কংগ্রেসীরা বছরে একবার ছুটির সময়ে একত্র হয়ে কতকগুলি প্রস্তাব পাস করাকেই চরম রাজনৈতিক কর্ম মনে করতো। কিন্তু তিলক জানতেন, কতকগুলি নিরীহ প্রস্তাব পাস করলেই জাতিকে জাগ্রত করা যায় না। তাই নরমপন্থীরা যখন কংগ্রেস অধিবেশনে ছুটির দিনগুলি কাটিয়ে নিজ নিজ কাজে গিয়ে নিযুক্ত হলেন, তখন তিলক সারা মহারাষ্ট্রে ঘুরে গ'ড়ে তুলতে লাগলেন রাজনৈতিক সংগঠন। এতোদিন

কংগ্রেসের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের কোনো প্রতিষ্ঠানগত যোগাযোগ ছিল না। তিলক সারা মহারাষ্ট্রে তালুক এসোসিয়েসন গঠন করে তালুক ও জেলার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্থা গ'ড়ে তুলতে লাগলেন। ঐ বৎসর ধুলিয়ায় বোম্বাইয়ের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হ'লো, তাতে জাতীয় দলের প্রস্তাব ও কর্মসূচীগুলিই হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হ'লো। সুরাট কংগ্রেসে তিলককে যে অপমান ও লাঞ্ছনা করা হয়েছিল, যেন তার সমুচিত জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ধুলিয়ার বিপুল জনতা তিলককে তাদের অবিসম্বাদী নেতারূপে অভিনন্দন জানালো। ধুলিয়া প্রাদেশিক সভায় তিলক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, স্বায়ত্ত শাসনই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, বৃটিশের করুণা-কণা নয়। তিলকের এই ঘোষণায় নরমপন্থীরা ভীত হয়ে উঠলো, বৃটিশ শাসনের অবসান তাদের কল্পনাতীত ছিল। নরমপন্থী কাগজগুলি তিলককে হঠকারী বুদ্ধিহীন ব'লে ঘোষণা করতে পেছপা হ'লো না। কিন্তু ভেকের কলরবে কি সিংহ ভয় পায়? তিলক প্রতিদিন সভা-সমিতিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, ভারতের দাবী সামান্য শাসন-সংস্কার নয়, অধিকসংখ্যক চাকরি নয়—ভারতের দাবী স্বায়ত্ত শাসন, ভারতের দাবী স্বরাজ্য। তিলক এই ধ্বনিই প্রতি সভায় উচ্চারণ করতে লাগলেন "স্বরাজ্য আমার জন্মগত অধিকার; এই অধিকার আমি লাভ করবই।" (Swarajya is my birthright; I will have it.) তাঁর এই ধ্বনি শত শত কণ্ঠে দেশময় ধ্বনিত হ'তে লাগলো।

তিলক "রাষ্ট্রমত" নামে একটি দৈনিক কাগজ প্রকরাশে

জন্যও অর্থ সংগ্রহ করলেন। গণপতি ও শিবাজী উৎসবগুলিও ক্রমেই নূতন রূপ গ্রহণ করলো। স্বরাজের দাবী সেগুলিতেও ধ্বনিত হ'তে লাগলো।

বিশ

তিলক মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রচার কার্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিক থেকেই ক'রে আসছিলেন। কংগ্রেসও বছরের পর বছর ধ'রে মদ্য বিক্রয় হ্রাসের নীতি গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করছিল। মাদকদ্রব্য থেকে প্রাদেশিক সরকারের মোটা টাকা আয় হ'ত। তাই প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে কর্ণপাত করলো না। এমন কি, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শকেও তারা উপেক্ষা ক'রে চললো। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় জনমত জেনে তারপর নূতন দোকান খোলার অনুমতি দিতে প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার এই নির্দেশ পালন করা প্রয়োজন মনে করলো না।

"ভারতীয় মাদক বর্জন সংঘ" (Indian Temperance Association) নামে একটি সংঘ বহু বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় ও পরামর্শ সম্পর্কেও প্রাদেশিক সরকার নির্বিকার রইলো। পুনায় জেলা সম্মেলনে তিলক সরকারের আবগারী নীতির নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তরুণদিগকে মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিবারণের জন্য সচেষ্ট হ'তে বললেন। তিলকের

প্রস্তাব অনুসারে স্থির হ'লো মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং করা হবে। পিকেটিং সম্পূর্ণ অহিংসাত্মক রীতি। তাছাড়া তা বেআইনীও নয়। কারণ অপরকে বোঝাবার অধিকার সকল মানুষেরই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হ'লো। কয়েকদিনের মধ্যেই পুনায় মদের দোকানগুলিতে শুরু হ'লো পিকেটিং। স্বেচ্ছাসেবকদের কেবল উপস্থিতির ফলেই ক্রেতার সংখ্যা খুব ক'মে গেল। মদের দোকানগুলি উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। মদ থেকে প্রচুর রাজস্ব আসতো; এখন সে পরিমাণ ক'মে যে নগণ্য হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ রইলো না। দোকানদাররা স্বেচ্ছাসেবকদের উপর মারপিট করলো। কিন্তু তাতেও স্বেচ্ছাসেবকরা অটল রইলেন, প্রতিশোধাত্মক কোনো কাজই করলেন না। সরকার তখন নিজেই পিকেটিং বন্ধের জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। পিকেটিং আইনসঙ্গত উপায়েই করা হচ্ছিল। তবু পুলিসের আদেশ অমান্যের অভিযোগে বহু স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফ্‌তার করা হ'লো।

কিন্তু তাতেও পিকেটিং বন্ধ হ'লো না। দলে দলে নূতন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিংয়ের কাজে যোগ দিলো। কয়েক দিনের মধ্যে পিকেটিং পুনা থেকে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়লো। পিকেটিং বন্ধের জন্যে অনেক জায়গায় ১৪৪ ধারা জারী করা হ'লো। পুলিস স্বেচ্ছাসেবকদের বলপ্রয়োগ করতে লাগলো। সরকারের এই কার্যের প্রতিবাদে পুনায় প্রায় ১২০০০ লোকের এক বিরাট জনসভা হ'লো। এই সভা

পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গভর্নরের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করলো। ডাঃ ভাণ্ডারকর এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনিই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করলেন। আলোচনার সময়ে যাতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া থাকে, সেজন্য সাময়িকভাবে তিলক পিকেটিং বন্ধ রাখলেন। ২৩-এ এপ্রিল তারিখে তিলক পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবককে প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আলোচনা ব্যর্থ হ'লে আবার পিকেটিং আরম্ভ করবেন। গভর্নর আলোচনার তারিখ কয়েক সপ্তাহ বাদে, ৬ই জুলাই তারিখে, স্থির করলেন। কিন্তু ৬ই জুলাই আসবার দু' সপ্তাহ আগেই, ২৪শে জুন তারিখে, তিলককে হঠাৎ গ্রেফ্তার করা হ'লো। তিলক সরকারের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে যে শান্তিপূর্ণ উপায় আবিষ্কার করেছিলেন, তার পরিণতি সম্পর্কে সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। মাদক বর্জনের আন্দোলনকে তিলক যে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন, তার ফলে সরকারের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তিলককে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করবার প্রয়োজন হ'লো। সরকার অন্য অজুহাতে তাঁকে গ্রেফ্তার করলো।

একুশ

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশে যে বৃটিশবিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছিল, তা কেবল স্বদেশী আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের তরুণরা সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করছিলেন। তাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহের কথাও চিন্তা করছিলেন। কিন্তু কিভাবে

সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করা যাবে? ··· সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল অস্ত্র সংগ্রহের সমস্যা। প্যারিসে কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী, হেমচন্দ্র দাস, সেনাপতি বপৎ ও হোতিলাল বর্মা একজন রুশ বিপ্লবীর কাছে বোমা তৈরির কৌশল শিখেছিলেন। তাঁরা দেশে ফিরে এলে দেশের তরুণরা অনেকেই বোমা তৈরি করতে লাগলেন এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় বহু সন্ত্রাসবাদী দল গ'ড়ে উঠলো। এইভাবে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০-এ এপ্রিল তারিখে ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বপ্রথম বোমা প্রবেশ করলো।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা-কালে কিংস্‌ফোর্ড বাংলাদেশের কতকগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদককে খুবই কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন, কয়েকজন বিপ্লবী নির্মমভাবে বেত্রাঘাতের দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা থেকে বদলী হয়ে জেলা জজ হয়ে মজফ্‌ফরপুর যান। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী তাঁকে হত্যা করবার জন্যে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গাড়ি মনে ক'রে একটি গাড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঐ গাড়ি কিংস্‌ফোর্ডের ছিল না—ছিল প্রিঙ্গল কেনেডী নামে জনৈক ভারতপ্রেমিক ইউরোপীয়ানের। ঐ গাড়িতে মিসেস কেনেডী ও তাঁর মেয়ে ছিলেন। বোমার আঘাতে তাঁরা দু'জনেই মারা গেলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লেন। প্রফুল্ল চাকী রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করলেন এবং বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হ'লো। ক্ষুদিরামের ফাঁসী ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার করলো। তাঁর ছবি হাজারে হাজারে বিক্রি হ'লো। তাঁর নাম

তরুণদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। সারা ভারতে ইংরেজরা ভীত হয়ে উঠলো। ঐ বৎসর সিপাহী বিদ্রোহের পর অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হয়েছিল। তাই চারিদিকের আবহাওয়ায় এমন একটা ভাব প্রকাশ পেতে লাগলো যে, সিপাহী বিদ্রোহের মতো কিছু একটা ঘটতে পারে।

তিলক ঐ সময় তাঁর "কেশরী" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে বার বার এই কথা লিখলেন যে, এখনও বৃটিশ সরকারের সতর্ক হওয়া উচিত। বোমা অপেক্ষাকৃত সহজে প্রস্তুত করা যায়। ভারতীয় কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে যদি এই পথ গ্রহণ করে, তা শুভ হবে না। সুতরাং বৃটিশ সরকারের উচিত ভারতীয় জনমতকে স্বীকার করা এবং ভারতীয়গণের দাবী উপেক্ষা না করা।

তিলকের মতো চরমপন্থী নেতাকে এই সময়ে বাইরে রাখা বৃটিশ সরকার বিপজ্জনক মনে করলো। কি উপায়ে তিলককে কারাগারে ঢোকানো যায়, সেই হ'লো তাদের একমাত্র চিন্তা। তিলকের প্রবন্ধগুলি তন্নতন্ন ক'রে প'ড়ে দেখা হ'লো, তার মধ্যে রাজদ্রোহ বা সন্ত্রাসবাদের প্ররোচনামূলক কিছু আছে কি না। কারণ, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তিলকের কোনও যোগ ছিল না। তিনি কেবল সেগুলির উল্লেখ ক'রে বৃটিশ সরকারকে সতর্ক ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। অবশেষে সরকার ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে "কেশরী"-তে প্রকাশিত তিলকের একটি প্রবন্ধে রাজদ্রোহের গন্ধ পেলো। কিন্তু বিচারে ঐ মামলা টিকবে কিনা, সে সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। তিলক ছিলেন ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও শক্তিশালী নেতা। তাঁকে

একটি মামলায় জড়িত করা এবং সেই মামলায় হেরে যাওয়া, তার ফল যে সরকারের পক্ষে ভয়ংকর হবে, সরকার তা জানতো। তাই তিলকের বিরুদ্ধে মামলা সম্পর্কে তারা ইতস্তত করতে লাগলো। কিন্তু এই সময় ৯ই জুন তারিখে, তিলক একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে বৃটিশবিরোধী স্থর বেশ চড়া ছিল। এই প্রবন্ধের জন্যে যে তিলককে রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত করা যাবে, সে সম্পর্কে সরকার প্রায় নিঃসন্দেহ হ'লো। পুনার বদলে বোম্বাইয়ে যাতে বিচার হ'তে পারে, এমন একটি সুযোগও সরকার খুঁজছিল। ২৪-এ জুন তারিখে তিলক বোম্বাই গিয়েছিলেন। সেদিন সেখানেই তাঁকে সন্ধ্যা ৬টার সময় গ্রেফ্তার করা হ'লো। পুনাতে পুলিশ তাঁর বাড়ি ও ছাপাখানা তল্লাস করলো। পুলিশ বহু কাগজ-পত্র ও একখানি কার্ড নিয়ে গেলো। ঐ কার্ডখানিতে আধুনিক বিস্ফোরক সংক্রান্ত দু'খানি বইয়ের নাম ছিল। পরে এই কার্ডখানি তিলকের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে মামলায় ব্যবহৃত হয়েছিল।

তিলকের গ্রেফ্তারের সংবাদ আগুনের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। ফলে দেশে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। পরদিন তিলককে "কেশরীর" সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হ'লো। সরকার পক্ষের উকিল তৈরী হ'তে পারেন নি, এই কারণে ২৯-এ জুন পর্যন্ত মামলা মুলতবী রইলো। জামিনে মুক্তির জন্য তিলকের পক্ষ থেকে আবেদন করা হ'লো। ম্যাজিস্ট্রেট সে আবেদন বাতিল ক'রে দিলেন। এখন

তিলকের কৌঁসুলী ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি জামিনের জন্য তিলকের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আবেদন করলেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, দশ বছর আগে যিনি তিলকের মামলা চালিয়েছিলেন, সেই দাভার এখন হয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচাপতি। সেদিন তিলকের মুক্তির জন্যে দাভার যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলেন, জিন্না ঠিক সেই সকল যুক্তিই দেখালেন। কিন্তু দাভার সেগুলি নির্বিকারচিত্তে অগ্রাহ্য করলেন। তিলকের ভাগ্যে জামিন মিললো না। পদের এমনই মহিমা!

১৩ই জুলাই হাইকোর্টে দাভারের এজলাসে তিলকের বিচার শুরু হ'লো। ১২ই মে ও ৯ই জুনের দু'টি লেখার জন্য দু'টি পৃথক মামলা আনা হয়েছিল। তিলকের আপত্তি সত্ত্বেও ঐ দু'টি মামলার বিচার একসঙ্গে শুরু হ'লো। তিলক যাতে কোনভাবেই অব্যাহতি পেতে না পারেন, সেজন্য বড়লাট থেকে শুরু ক'রে অন্যান্য সকল সরকারী পদস্থ কর্মকর্তারাই প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। একটি চিঠিতে বোম্বাই সরকারকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দেওয়া হ'লো যে, "এখন দয়া বা অনুকম্পা দেখাবার সময় নয়।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিচারের সময় বিশেষ জুরী নিয়োগ করা হ'লে দাভার তার প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, বিশেষ জুরীর অর্থই হ'লো অধিকসংখ্যক ইউরোপীয়কে জুরীতে নিয়োগ করা। তিলকের প্রবন্ধগুলি মারাঠী ভাষায় লেখা ছিল। কিন্তু ইউরোপীয়রা মারাঠী ভাষা জানেন না। তাছাড়া ইউরোপীয়দের কাছ থেকে নিরপেক্ষ রায় পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু এখন দাভার

নিজেই বিশেষ জুরী নিয়োগ করলেন। জুরীতে ন'জনের মধ্যে সাতজন রইলেন ইউরোপীয়ান—মানে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় একজন বেশী।

সুতরাং বিচারের রায় যে কি হবে, তা প্রথম থেকেই অনুমান করা যেতে লাগলো। এ যে বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই রইলো না। বিচারের সময় তিলক নিজেই তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। তিনি পাঁচ দিন ক্রমাগত আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতার জন্য ২১ ঘণ্টা ১০ মিনিট লেগেছিল। পৃথিবীতে আত্মসমর্থনের ইতিহাসে এইটিই দীর্ঘতম বক্তৃতা।

তিলকের পর অ্যাডভোকেট জেনারেল তাঁর বক্তব্য বললেন। তিলক ইংলণ্ডের আইন উদ্ধৃত ক'রে বহু স্থলে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল বললেন, ইংলণ্ডের আইন এখানে প্রযোজ্য নয়। বিস্ফোরকের বিবরণ সংক্রান্ত দু'খানি বইয়ের নাম লেখা যে কার্ডখানি পাওয়া গিয়েছিল, তিলক তার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেছিলেন, সরকার সম্প্রতি যে বিস্ফোরক আইন পাস করেছেন, তাতে কেরোসিন তেলকেও বিস্ফোরকের মধ্যে ধরা হয়েছে। ঐ আইনের সমালোচনা করবার জন্য বিস্ফোরক বলতে প্রকৃত কি বোঝায়, তা জানার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি ঐ বই দু'খানির নাম সংগ্রহ করেছিলেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল কিন্তু কার্ডখানিকে অন্য আলোকে দেখাতে চাইলেন; এর সঙ্গে যে বোমার সম্পর্ক আছে, তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হ'লো।

২২-এ জুলাই ছিল বিচারের শেষ দিন। ঐদিন অনেক রাত পর্যন্ত আদালতের কাজ চালিয়ে বিচার শেষ ক'রে দেবেন, এই রকম স্থির করেছিলেন বিচারপতি। এর অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। তিলকের গ্রেফ্তারের সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই বোম্বাইয়ে জনসাধারণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তারা কয়েকদিন ধরে যেখানে-সেখানে পথে ঘাটে জটলা করছিল, ইউরোপীয়দের উপর ইটপাটকেল ছুঁড়ছিল; অনেক জায়গায় পুলিস লাঠি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছিল। জেল হাজত থেকে তিলককে আদালতে আনা বা আদালত থেকে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই বিচারের সময় কয়েকদিন হাইকোর্টেই একটি বিশেষ হাজত ক'রে সেখানে তিলককে রাখা হয়েছিল। আজ বিচারের রায় হবে জেনে বর্ষার ঘনঘটা ও দুর্যোগ উপেক্ষা ক'রে হাজার হাজার লোক আদালতের বাইরে অপেক্ষা করছিল। বিচারপতি ভেবেছিলেন, অনেক রাত পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লোকে দাঁড়িয়ে থাকবে না। তাই রাত পর্যন্ত আদালতের কাজ চালিয়ে রাতেই রায় দেওয়া তিনি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, দেশের জনসাধারণ তিলককে কতখানি ভালোবাসে। তিলক তাদের কাছে তাদের স্বাধীনতার প্রতীক, শিবাজীর অবতার, দ্বিতীয় শিবাজী! তাই তারা তিলককে বলে "তিলক মহারাজ"! অনেকে তাঁকে ভগবানের অবতার ব'লেও মনে করে—বলে "তিলক ভগবান"। তারা ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে রায় শুনবার জন্য রাত্রির অন্ধকারেই অপেক্ষা করতে লাগলো।

তখন রাত ৮টা। বিচারপতির ভাষণের পর জুরীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্যে উঠে গেল। ৯-২০ মিনিটে তারা ফিরে এলো। ইউরোপীয় ৭ জন তিলকের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় দু'জন তিলকের পক্ষে রায় দিলো। জজ অধিকাংশের মতকেই গ্রহণ করলেন এবং তিলকই অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। জজ দু'টি মামলার জন্যেই তিলককে পর পর তিন বছর ক'রে—অর্থাৎ ছ' বছরের জন্য—দ্বীপান্তরের দণ্ড দিলেন। সেই সঙ্গে তিলকের এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডও করা হ'লো।

এইরকম রায়ের জন্য তিলক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মধ্যে উদ্‌বেগ বা ভয়ের সামান্য লক্ষণও দেখা গেল না। তাঁর মুখের নির্ভীক্ প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রইলো।

রাত দশটায় আদালতের কাজ শেষ হ'লো। বাইরে ভ্যান অপেক্ষা করছিল। পুলিস তিলককে তাতে তুললো। অবিরাম বর্ষণ ও গভীর অন্ধকারের মধ্যে ভ্যান দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। অশ্বারোহী পুলিস জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিতে লাগলো। সেই অন্ধকার, বর্ষণ, ঝড় ও বজ্রপাতের মধ্যেও ধ্বনিত হ'তে লাগলো জনতার কণ্ঠস্বর—"জয়! তিলক মহারাজ কী জয়!"

বাইশ

ঐ সময়ে বোম্বাইয়ে প্রায় ৮৪টি মিলে এক লাখ শ্রমিক কাজ করতো। স্বদেশী আন্দোলন ও মাদক দ্রব্য বর্জনের সময়ে তিলক বহুবার এই শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। তিলকের গ্রেফ্‌তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক অঞ্চলে অত্যন্ত উত্তেজনা

দেখা দিল। বহুসংখ্যক শ্রমিক মিলে কাজ করা বন্ধ করলো। পুলিস এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না ভেবে সৈন্যবাহিনী আমদানী করা হ'লো। ঐ সময়ে বোম্বাইয়ে যে সৈন্যবাহিনী ছিল, তা পর্যাপ্ত হবে না জেনে, অন্য অঞ্চল থেকেও সৈন্যবাহিনী আনার ব্যবস্থা করা হ'লো। কিন্তু সরকারের সকল চেষ্টা হ'লো ব্যর্থ। ১৬ই জুলাই তারিখে কয়েকটি মিলে ধর্মঘট শুরু হ'লো। ধর্মঘট ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। পরদিন ২৮টি মিলে ধর্মঘট হ'লো। যেসব মিলে কাজ চলছিল, ধর্মঘটী শ্রমিকরা দলে দলে সেসব মিলে গিয়ে হামলা ক'রে আসবাবপত্র ভেঙে ফেললো। মিলওয়ালারা সরকারের শরণাপন্ন হ'লে সরকার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করলো। পথে ঘাটে ক্রুদ্ধ জনতা ইউরোপীয়দের আক্রমণ করতে লাগলো। ইউরোপীয়রা ভীত হয়ে প্রাণভয়ে গৃহকোণে আশ্রয় নিলো। ১৯-এ জুলাই তারিখে সমস্ত মিলেই ধর্মঘট হ'লো। ২০-এ তারিখেও ধর্মঘট অব্যাহত রইলো। চারিদিকে ইউরোপীয়দের উপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চলতে লাগলো। অনেক জায়গায় পুলিস গুলী চালালো। ২৩ তারিখে ছিল তিলকের জন্মদিন। তিলকের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশের আদেশ পূর্বদিন রাত্রিতেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ২৩-এ জুলাই বোম্বাইয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহের অবস্থা দেখা দিলো। উত্তেজিত জনতা "তিলক মহারাজ কী জয়!" "ছত্রপতি তিলক কী জয়!" ধ্বনি দিতে দিতে শহরময় ঘুরতে লাগলো। তাদের মুখে এক কথা—"আমরা আমাদের তিলক মহারাজকে চাই! আমরা তাঁকে ফিরিয়ে আনবোই!"

তিলকের ছ' বছর দ্বীপান্তরের প্রতি বছরের জন্য একদিন হিসাবে ছ'দিন শহরের দোকানপাট সব বন্ধ রইলো। পুলিস ও সৈন্যদল বহু স্থানে গুলী চালালো। গুলীতে বহু লোক হতাহত হ'লো। নিহতের সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি দাঁড়ালো। তবু শ্রমিকরা নির্ভীকচিত্তে তিলকের জয়ধ্বনি দিতে দিতে শহরে ঘুরতে লাগলো। দোকানপাট বন্ধ রইলো। পথঘাট যানবাহনশূন্য ও জনহীন রইলো। নবজাগ্রত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে আর ঘটেনি। সুদূর ইউরোপ থেকে মহাবিপ্লবী লেনিনও ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর এই অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত ক'রে বাণী পাঠালেন।

বোম্বাইয়ের এই অবস্থা আয়ত্তে আনতে সরকারকে বেশ বেগ পেতে হ'লো। এমন কি তিলকের বিরুদ্ধে মামলা আনায় বোম্বাই সরকার যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিল, তাও উচ্চপদস্থ সরকারী মহলে নিন্দিত হলো। তৎকালীন ভারত সচিব মর্লে বোম্বাইয়ের গভর্নরকে একটি চিঠিতে জানালেন যে, "আপনি যদি এ বিষয়ে আমার বা আপনার উকিলদের পরামর্শ নিতেন, তবে তিলককে দণ্ডিত করায় যে অনিষ্ট হয়েছে, তা কখনো হ'তে পারতো না।"

ইংলণ্ডেও অনেকে বোম্বাই সরকারের নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করলেন। তাঁরা বললেন, তিলককে দণ্ডিত ক'রে তাঁর জনপ্রিয়তা শতগুণে বাড়ানো হয়েছে। তিলককে "শহীদ" ক'রে সরকার দূরদর্শিতার পরিচয় দেননি।

দণ্ডলাভের পর তিলক কয়েকদিন শবরমতী জেলে আটক

রইলেন। তারপর তাঁকে ব্রহ্মদেশে মান্দালয়ে নির্বাসিত করার ব্যবস্থা হ'লো। তাঁর হাজার টাকা জরিমানা মকুব করা হ'লো। কিন্তু আন্দামানে পাঠালে তাঁর যে সুযোগ-সুবিধা থাকতো, তা তাঁর রইলো না। আন্দামানে বন্দীরা কিছু টাকা জামিন দিয়ে মুক্ত অবস্থায় থাকবার সুযোগ পায়। কিন্তু মান্দালয়ে তিলকের জন্যে জেলে ২০ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া একটি ঘরে দীর্ঘ ছ'বছর আটক থাকবার ব্যবস্থা হ'লো।

প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করবার অনুমতির পাওয়ার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের কাছে যে আবেদন করা হয়েছিল, তা বাতিল হ'লো। হাউস অব লর্ডসে আবেদন করবার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'লো। অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিলক "হার্ডিং" নামে এক জাহাজে চ'ড়ে রেঙ্গুন যাত্রা করলেন।

মান্দালয় জেলে থাকা-কালে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে জানালেন, তিনি যদি শর্তাধীনে মুক্তি পেতে চান, সে চেষ্টা করা যেতে পারে। তিলক শর্তাধীনে মুক্তি পেতে রাজী হলেন না। বললেন, "শর্তাধীনে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে জেলে থাকাও আমার পক্ষে শ্রেয়।"

জেলে তিলককে মাত্র দু'খানি ক'রে বই একসঙ্গে দেওয়া হ'তো। তাঁর সব চিঠিপত্র সেন্সর ক'রে পাঠানো হ'তো। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করলে জেলের একজন কর্মচারী সর্বদা উপস্থিত থাকতো। অনেক সময় তারা কথাবার্তায় বাধাও দিতো। তিলক অত্যন্ত সাধারণ খাবার পেতেন। প্রকৃতপক্ষে কেবল ঘি ও গমের খাদ্যের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হ'তো। বাড়ি থেকে ঘি পাঠালে তা তিনি ব্যবহার করতে পেতেন। তিলক

গাছপালা লাগাতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর লাগানো অনেক গাছ মান্দালয় জেলে আজও আছে।

জেলে তিলক তাঁর অধিকাংশ সময়ই লেখাপড়ায় কাটাতেন। তিনি এই সময় গীতা সম্পর্কে মারাঠী ভাষায় একখানি সুবৃহৎ বই লেখেন। বইখানির নাম "গীতারহস্য"। গীতারহস্যে তিনি গীতার বাণী ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, কর্মযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইখানিও পরে প্রকাশিত হ'লে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। গীতার এই অপূর্ব ব্যাখ্যা বহু রাজনৈতিক কর্মীকে কর্মে ও আত্মত্যাগে উদ্‌বুদ্ধ করে।

তিলক তাঁর কারাবাসের দিনগুলি সম্পর্কে কখনো কোনো অভিযোগ করেন নি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তরুণ নায়ক সুভাষচন্দ্রও এই জেলে আটক ছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, "আমি প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি যে, লোকমান্য কিভাবে এখানে তাঁর চিন্তা ও রচনার কাজে এমন গভীরভাবে মনোনিবেশ করতেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে না পারলে, আনন্দ বেদনা শীত গ্রীষ্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার না হ'লে, কেউ কখনো এই ভয়াবহ পরিবেশের উর্ধ্বে উঠতে পারে না।"

তিলক যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও আনন্দবেদনার উর্ধ্বে উঠেছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যই তিনি নিজের জীবনে গীতার বাণীর পরিপূর্ণ অনুশীলন করেছিলেন।

মান্দালয় জেলে তিলকের প্রায় চার বৎসর অতিবাহিত হ'লো। এই সময়ে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় (জুন, ১৯১২)। স্ত্রীর

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিলক একটি পত্রে লেখেন—"আমি দুঃখকে শান্তচিত্তে মেনে নিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, এই সংবাদ আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুসারে, স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রীর মৃত্যু অবাঞ্ছিত নয়। কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখের কারণ এই যে, তাঁর শেষ মুহূর্তে আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে থাকতে পেলাম না।" সেই সঙ্গে তিনি একথাও লেখেন যে, তাঁর ছেলেরা যেন শোকে বিহ্বল না হয়ে পড়ে। তারা যেন সাহসীর মতো দুঃখের সম্মুখীন হ'তে পারে। এর চেয়ে অনেক অল্প বয়য়ে তিনি নিজেও পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলেন।

তিলককে কোনও খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হ'তো না। তাঁর কথা দেশের লোকে ভুলে গেছে, দেশে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, এমনি একটা ধারণা তাঁর মনে সৃষ্টি করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বৃটিশ সরকার এবং গোখেল-প্রমুখ নরমপন্থী পরিচালিত কংগ্রেস যথেষ্ট চেষ্টা করছিল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের নিয়মাবলী নূতন ক'রে এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যে, তাতে চরমপন্থীদের স্থান ছিল না। তিলক নির্বাসিত হওয়ার পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে গোখেল বৃটিশ সরকারের সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতা করবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ বছর কংগ্রেসে তিলকের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় নি। চরমপন্থী দলকে ধ্বংস করবার জন্যে সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। চরমপন্থীদের উপর নির্যাতনের সীমা ছিল না। তাঁদের অন্যতম নেতা অরবিন্দ ঘোষ

(পরে শ্রীঅরবিন্দ) গোপনে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল ত্যাগ ক'রে পন্দিচেরীতে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর বিপিনচন্দ্র পাল চ'লে গিয়েছিলেন ইউরোপে। এইভাবে তিলকের চরমপন্থী দল ভেঙে পড়েছিল।

তা হ'লেও জনসাধারণের চিত্তে তিলকের যে স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল। তা ছিল অম্লান ও অক্ষয়। তিলক কবে ফিরবেন, সেজন্য জনসাধারণ দিন, মাস, বৎসর অধীর আগ্রহে গণনা করছিল। বিশেষ ক'রে ভারতের তরুণ সম্প্রদায় তিলককে তাঁদের অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। গোখেল-পরিচালিত কংগ্রেসের বৃটিশ তোষণ তাঁদের কাছে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না।

নির্বাসনের ছ'বছর প্রায় শেষ হ'তে চললো। দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় অনেকখানি পরিবর্তন ঘটলেও তিলক ফিরে এলে তা যাতে অসুবিধাজনক হয়ে না ওঠে, সে বিষয়ে ইংরেজ সরকার লক্ষ্য রাখলো। তিলকের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। এ সময় তাঁর পরিবারকে সাহায্য-দানের জন্যে কেলকার ও খারে ছাড়া অন্য কোনও নেতা অগ্রসর হননি। তিলকের দলছাড়া অবস্থার এ-ও একটা লক্ষণ। তাছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে বোম্বাই সরকারকে জানিয়েছিল যে, তিলকের সে জনপ্রিয়তা এখন আর নেই। তবু ভারত সরকার এ নিয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা করলো। তিলককে কোনও নির্ধারিত দিনে মুক্তি দিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সভা-সমিতি হ'তে পারে। সভা-সমিতি থেকে

উত্তেজনা এবং বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তাই সরকার নির্বাসনের মেয়াদ ফুরোবার কিছু আগেই তিলককে মুক্তি দেওয়া উচিত মনে করলো এবং এ বিষয়ে সব কিছুই গোপন রাখা হ'লো।

তিলককে মান্দালয় থেকে পুনায় আনার কাজ সম্পূর্ণ গোপনে সারা হ'লো। তাঁকে কয়েকদিন যারবেদা জেলে রাখা হ'লো। কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়া একথা আর কেউ জানতো না। তারপর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে গভীর রাত্রিতে তাঁকে যারবেদা জেল থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হ'লো। তিলক যখন বাড়িতে পৌঁছলেন, তখন রাত ১২টা ১৫ মিনিট। তাঁকে নামিয়ে দিয়ে পুলিসের গাড়ি চ'লে গেল।

আজ ছ' বছর বাদে নিজের বাড়ির দরজায় একাকী তিলক! তাঁর আগমনের অপেক্ষায় যিনি শত শত বিনিদ্র রজনী জেগে থাকতেন, তিনি আজ নেই! বাড়ির নূতন দারোয়ানও তাঁকে চিনতে পারলো না। তখন তিনি বাড়ির লোকদের নাম ধ'রে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। তারা অবাক হয়ে সবাই ছুটে এলো। এমন ভাবে ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতার ফিরে আসার কথা কেউ কল্পনাও করে নি!

কিন্তু পরদিন তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হাজার হাজার লোক তাঁর বাড়ির সামনে এসে একটি বার তাঁকে দেখবার জন্যে ভীড় করতে লাগলো। সরকার এই রকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তিলক যে আজও

ভারতের জনসাধারণের চিত্ত আলো ক'রে আছেন, তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল।

সরকার ও নরমপন্থী কংগ্রেস নেতারা আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

তেইশ

তিলক যখন মান্দালয় জেলে, তখন বিলাতের "টাইম্‌স্" পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক স্যার ভ্যালেন্টিন চিরল একখানি বই লিখেছিলেন। বইখানার নাম "ইণ্ডিয়ান আন্‌রেস্ট"। বইখানি তিনি তৎকালীন ভারত সচিবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। বইখানি রচনার জন্য উৎসাহ ও মালমসলা সরবরাহ করেছিলেন বোম্বাই তথা ভারত সরকার। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে ইংলণ্ডে, আমেরিকায় ও ইউরোপে বিকৃত ক'রে দেখানোই ছিল এই বইয়ের উদ্দেশ্য। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা তিলককে সেজন্যে হেয় প্রতিপন্ন করবার আগা-গোড়া চেষ্টা ছিল এই বইয়ে। তিলক সম্পর্কে অনেক মিথ্যা কথা এতে লেখা হয়েছিল। এই বইখানির প্রচারের ফলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন যে অনেকখানি সহানুভূতি হারাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই এই বইয়ের প্রচার বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিলক অবিলম্বে ইংলণ্ডের হাইকোর্টে চিরলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনলেন। বোম্বাই সরকার ভয় পেলো। কারণ তারাই চিরলকে এইসব মিথ্যা তথ্য সরবরাহ

করেছিল। চিরলও তাদের ওপর এই মামলার দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। ফলে মামলাটা কতক পরিমাণে ভারত সরকার ও তিলকের মধ্যেই দাঁড়ালো। তিলক ইংলণ্ডের হাইকোর্টে এই মামলা শুরু করেছিলেন। কারণ, ভারতীয় হাইকোর্টে যে তিনি বিন্দুমাত্র সুবিচার পাবেন না, তা তিনি ভালো ক'রেই জানতেন। ইংলণ্ডের হাইকোর্টের স্বরূপ তিনি তখনো জানতেন না।

মামলার বিচার হ'তে দেরি ছিল। ইতিমধ্যে তিলক আবার পূর্ণোদ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বহুমূত্র রোগ ও দীর্ঘ কারাভোগে তাঁর শারীরিক শক্তি অনেকখানি হ্রাস পেলেও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন তিনি অবিলম্বে যে রাজনৈতিক দাবী দেশে তুলতেন, তা এর আগে উচ্চারণ করবার সাহস কারও ছিল না। এতোদিন বৃটিশের অধীনে দায়িত্বশীল সরকারই (Responsible Government) ভারতীয় কংগ্রেসের দাবী ছিল। তিলক ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্বরাজের কথা বলছিলেন। কিন্তু তখনও তাকে তিনি দেশবাসীর দাবীর দ্বারা রাজনৈতিক রূপ দিতে পারেন নি। এখন তা-ই হ'লো তাঁর প্রধান কর্তব্য। এ ব্যাপারে ভারতহিতৈষিণী বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা অ্যানী বেসাণ্টও তাঁর সহায় হলেন। তাঁরা উভয়েই স্বায়ত্ত শাসন বা হোম রুলের (Home Rule) দাবী তুললেন। তাঁরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, ভারতবাসী এখন শাসন পরিষদে বা আইন-সভায় কয়েকটি আসন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। ভারত চায় এমন আইনসভা, যা শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করবে এবং যার সদস্যরা

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ ভারত চায় স্বরাজ বা স্বায়ত্ত শাসন। ভারত হ'তে চায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত একটি অংশ।

এজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসকে পুনরধিকার করা। কংগ্রেস নরমপন্থীদের কবলে থাকায় তা শাসন পরিষদে বা আইনসভায় অধিক সংখ্যায় আসন পাওয়াকেই আদর্শ ব'লে গণ্য করেছিল। তিলক কংগ্রেসকে নরমপন্থীদের কবল থেকে মুক্ত ক'রে তাকে স্বরাজের বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু তিলক ও তাঁর অনুগামীরা যাতে কংগ্রেসে স্থান না পান, সেজন্যে গোখেল, ফিরোজ শাহ্ মেটা প্রভৃতি নরমপন্থীরা প্রবল চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁরা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহকে সভাপতি মনোনীত করলেন। কিন্তু মেটার চেষ্টা ফলবতী হ'লো না। তিনি অকস্মাৎ মারা গেলেন। ঐ বৎসর গোখেলেরও মৃত্যু হ'লো। এইভাবে নরমপন্থীরা অত্যন্ত ক্ষীণবল হয়ে পড়লেন। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'লো, তাতে চরমপন্থীদের পুনরায় কংগ্রেস প্রবেশের পথ কিছুটা মুক্ত হ'লো। কিন্তু তিলক ও তাঁর অনুগামীরা ঐ অধিবেশনে স্থান পেলেন না। তা সত্ত্বেও মিসেস বেসান্ট কংগ্রেসে হোম রুলের প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। অবশ্য কংগ্রেসে নরমপন্থীদের সংখ্যাধিক্য থাকায় ঐ প্রস্তাব বাতিল হ'লো। কিন্তু তাতে কংগ্রেস যে জাগ্রত জনমতের চেয়ে অনেক পেছনে প'ড়ে আছে, তা-ই হ'লো প্রমাণিত। অ্যানী

বেসান্ট তাঁর "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজে "হোম রুল" স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২৭-এ ডিসেম্বর (১৯১৫) তারিখে তিনি হোম রুল লীগ স্থাপনের কথা বিবেচনার জন্য একটি সভা আহ্বান করলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদের পরামর্শক্রমে নরমপন্থীরা তাতে যোগ দিলো না। বোম্বাই কংগ্রেসে মিসেস বেসান্ট-প্রস্তাবিত হোম-রুল লীগের প্রস্তাব ভেস্তে গেল।

তিলক নিজেই এখন ইণ্ডিয়ান হোম রুল লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললেন। (১৯১৬)। দেশে তিলক ও মিসেস বেসান্টের নেতৃত্বে "হোম রুল" আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। "হোম রুল" বা স্বরাজই হ'লো এখন ভারতের রাজনৈতিক দাবী।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৩-এ জুলাই তিলক ষাট বৎসরে পদার্পণ করলেন। তাঁর অনুরাগীরা ঐ বৎসর তাঁকে তাঁর জন্মদিনে এক লক্ষ টাকার একটি তোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলো। জন্মতিথি পালনের জন্যে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় তিলককে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হ'লে তিনি বললেন, "এ টাকা আমি আমার পরিবারের জন্যে নিতে পারবো না। দেশের কাজের জন্যে এই টাকা ব্যবহৃত হবে, কেবল এই ভরসায় আমি এই টাকা নিতে পারি।"

ঐ বৎসর হোম রুলের প্রচারকার্যে তিনি সমগ্র দেশে ঘুরে বেড়ালেন। জুলাই মাসে পুনরায় তিনি পুনা কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভ করলেন। এইভাবে ন' বছর বাদে আবার কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হ'লো। ঐ বৎসর কংগ্রেসের

অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে যোগদানের যোগ্যতা লাভের জন্যে তার ঐ সদস্যপদ একান্ত প্রয়োজন ছিল।

হোম রুল সম্পর্কে বক্তৃতা আবার তাঁকে প্রায় জেলের মুখে টেনে আনলো। তিনি বেলগাঁও, আহম্মদনগর প্রভৃতি স্থানে "হোম রুল" সম্পর্কে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলিকে রাজদ্রোহমূলক ব'লে বোম্বাই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করলো। ২২-এ জুলাই তারিখে পুনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে এই মর্মে নোটিশ দিলেন যে, তিনি এই ধরনের প্রচার কার্য থেকে বিরত থাকবেন, এই শর্তে তিনি যেন ত্রিশ হাজার টাকার মুচলেকা দেন। তিলক এতে রাজী হবেন কেন? তিনি হাইকোর্টে আপীল করলেন। এবার কিন্তু হাইকোর্টের রায় তাঁর পক্ষেই গেল। "হোম রুল" সম্পর্কে প্রচারকার্যকে রাজদ্রোহমূলক কাজ বলা যায় না ব'লেই জজেরা নির্দেশ দিলেন। হাইকোর্টের এই নির্দেশ "হোম রুল" প্রচারের পক্ষে খুবই সহায়ক হ'লো।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের লখ্নৌ কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বৎসর কংগ্রেসে কেবল নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মিলন হ'লো না, ঐ বৎসর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেরও মিলন ঘটলো। চরমপন্থীদের উপর তিলকের কি রকম প্রভাব ছিল, ঐ বৎসর কংগ্রেসের একটি ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়। গান্ধীজী সেই সবেমাত্র ভারতীয় রাজনীতিতে এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি নরমপন্থী বা চরমপন্থী কোনও দলের নয়, তিনি উভয় দলের মিলন চান, তাই উভয় দল থেকে বাইরে থাকতে চান। তিনি বোম্বাই থেকে প্রতিনিধি হিসাবে

কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচনকালে চরমপন্থীরা তাঁর বিরোধিতা করায় গান্ধীজী পরাজিত হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিলক উঠে বললেন, Gandhi is Elected. তিলকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলবে কে? গান্ধী নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেবের চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদ ঘটেছিল, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাতে সাময়িকভাবে ছেদ পড়লো। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তিলকের চেষ্টায় মৈত্রী ঘটলো। তখন ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তা "লখ্‌নৌ চুক্তি" নামে বিখ্যাত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস ও লীগ এখন একযোগে স্বায়ত্ত শাসন দাবী করলো।

কংগ্রেসে তিলকের দল সংখ্যালঘু হ'লেও জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী। লখ্‌নৌ কংগ্রেসে তিলককে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হ'লো, তেমনটি এর আগে আর কোনও কংগ্রেস নেতা পান নি। তিনি লখ্‌নৌয়ে অনেকগুলি জনসভায় বক্তৃতা করলেন। একটি সভায় প্রায় বিশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। সে সময়ে কোনও রাজনৈতিক সভার পক্ষে তা কল্পনাতীত ছিল।

এই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) বেধেছিল। ইংরেজরা জার্মানির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করছিল, তাকে তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধ ব'লে প্রচার করছিল এবং এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের জনবল, ধনবল ও সম্পদ্ পরিপূর্ণরূপে ব্যবহারের চেষ্টা

করছিল। যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে তিনটি মতবাদ দেখা দিয়েছিল। এক দলের মত ছিল এই যে, ইংরেজরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা মুখে বললেও, তাদের উদ্দেশ্য নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করা ভারতবাসীদের আদৌ উচিত হবে না। এই মতবাদের লোকেরা গোপনে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন এবং মিত্রপক্ষের শত্রুদের সাহায্যও করছিলেন। তাঁদের কার্যকলাপ কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু অপর একদল ইংরেজদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথায় বিশ্বাস করছিলেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপদে ভারতের বিনা শর্তে সাহায্য দেওয়া উচিত, এই মত প্রচার করছিলেন। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন গান্ধীজী, তিনি রেক্রুটিং সার্জেণ্ট হয়ে ইংরেজদের জন্যে সৈন্য সংগ্রহও করছিলেন। কিন্তু তিলক এই দুই মতবাদের কোনটিতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলছিলেন, ইংরেজদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বুলিতে যদি কোনও ভাঁওতা না থাকে, যদি তা আন্তরিক হয়, তবে তারা ঘোষণা করুক যে, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেবে। এই রকম ঘোষণার শর্তেই কেবল ভারতবাসী ইংরেজদের সাহায্য করতে পারে। নইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করবার জন্যে ভারতবাসী তাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করবে না। এই সময় ইংরেজরা যে দলে দলে ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রপ্তানী করছিল, তিলক তারও তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিলকের এই মনোভাব বৃটিশ সরকারকে বিরক্ত ও বিব্রত করলো। তারা

তিলকের চেয়েও গান্ধীর উপর বেশী গুরুত্ব দিতে লাগলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন তিলকই ছিলেন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক এবং গান্ধী ছিলেন ভারতীয় রাজনীতিতে নবাগত। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে ইংরেজ সরকার যে যুদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করলো, তাতে তারা গান্ধীকে নিমন্ত্রণ করলো, কিন্তু তিলক, মিসেস বেসান্ট, মহম্মদ আলি, সওকত আলির মতো জনপ্রিয় নেতাদের বাদ দিল। গান্ধীজী এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলেও ঐ সম্মেলনে যোগ দিলেন। তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড। তাঁর কাজকে তৎকালীন ভারত সচিব মণ্টেগু মনে মনে সমর্থন করলেন না। তিনি ঐ সময় তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, "তিলক সম্পর্কে এ কথা বলতে পারি, আমি যদি ভারতের ভাইস্‌রয় হ'তাম, তবে যে কোনো উপায়ে আমি দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। কারণ, সম্ভবত তিনিই এখন ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ পুরুষ। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাস্তবিক প্রচুর সাহায্য করতে পারেন। তাঁকে সম্মেলনে না ডাকার অর্থ হ'লো ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকে সম্মেলন থেকে বাদ দেওয়া।"

মণ্টেগুর এই কথাগুলি একান্তই সত্য ছিল। সম্ভবত তাই জুন মাসে বোম্বাইয়ে যে যুদ্ধ সম্মিলন হয়, তাতে তিলককে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড উইলিংডন তিলক ও তাঁর অনুগামীদের হোম রুল প্রস্তাব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে তিলক তার প্রতিবাদ করলেন এবং তিলকের বক্তৃতায় সভাপতি লর্ড উইলিংডন বার বার বাধা দিলেন। ফলে

তিলক সভা ত্যাগ ক'রে চ'লে এলেন। পরের সপ্তাহে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে একটি জনসভা হ'লো। তাতে গান্ধীজী তিলকের প্রতি লর্ড উইলিংডনের এই ব্যবহারের নিন্দা করলেন। তবে তিনি বৃটেনের এই দুর্দিনে বিনা শর্তে সাহায্য করবার কথাও বললেন।

কিন্তু তিলক বিনা শর্তে যুদ্ধে সাহায্যের বিরোধিতা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "দেশের লোককে আমরা কি বলবো যে, ইংরেজদের জুলুম করবার শক্তি বাড়াবার জন্যে তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দাও ?—তা হ'তে পারে না।"

তিলকের এই ধরনের বক্তৃতা সম্পর্কে বোম্বাই সরকার তথা ভারত সরকার চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভারত সরকারের পরামর্শক্রমে বোম্বাই সরকার ভারত রক্ষা আইন অনুসারে তিলকের উপর এই মর্মে নোটিশ দিল যে, তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে কোনো জেলায় বক্তৃতা দিতে পারবেন না। তবে কংগ্রেসের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার তাঁর রইলো।

এই অবস্থায় তিলক ভারতে নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে থাকা উচিত মনে করলেন না। তিনি হোম রুলের প্রচারকার্যে ইংলণ্ড যেতে মনঃস্থ ক'রে পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করলেন। ভারত সরকার তিলককে পাসপোর্ট দিলেন; কারণ ভারতে তিলকের অনুপস্থিতি তাঁদের একান্ত কাম্য ছিল। তিলক তাঁর কয়েকজন অনুগামী সহ ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এই সময় ইংলণ্ড থেকে বৃটিশ সরকার ইংলণ্ডে তিলকের উপস্থিতি ক্ষতিকর হবে ভেবে তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করবার জন্য ভারত

সরকারকে নির্দেশ দিলেন। তিলকের ইংলণ্ড যাওয়া বন্ধ হ'লো। এ নিয়ে দেশে আবার গোলযোগ সৃষ্টি হ'লো।

তিলকও ক্ষান্ত হলেন না। তিনি জানালেন, ইংলণ্ডের হাইকোর্টে তাঁর মামলা চলছে। তার প্রস্তুতির জন্যে তাঁর ইংলণ্ড যাওয়া একান্ত দরকার। ভারত সরকারও বৃটিশ সরকারকে বোঝাতে লাগলো যে, ভারতের চেয়ে ইংলণ্ডে তিলক অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। অবশেষে তিলকের পাসপোর্ট জুটলো। তিনি ২৪-এ সেপ্টেম্বর (১৯১৮) তারিখে ইংলণ্ড রওনা হলেন এবং অক্টোবরের শেষাশেষি ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছলেন।

ইংলণ্ডে হোম রুলের প্রচারকার্যে তিনি খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সর্বত্র ঘুরে বহু সভায় বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ থাকতো। ভারতের অতীত গৌরব ও বর্তমান দুরবস্থার বহু চিত্র তিনি ইংরেজদের সামনে অভূতপূর্ণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরলেন। তিনি ইংরেজ শ্রোতাদের কাছে এই প্রশ্ন করলেন—"তোমরা ভারতীয়দের মানসিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করো। তবে তাদের নিজেদের দেশ শাসনের ক্ষমতা নেই, এই কথা বলো কেন?"

এই সময়ে ইংলণ্ডে স্যার ভ্যালেন্টিন চিরলের বিরুদ্ধে তাঁর মামলার বিচার হ'লো। বিচারে ইংরেজ জুরীরা তিলকের বিরুদ্ধেই রায় দিল। এখানেও আদালত যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বাঁধা, তা বুঝতে তিলকের বিলম্ব হ'লো না। তাই তিনি এই মামলার আপীল করতে অসম্মত হলেন।

ইংলণ্ডে তিলক এক বছর ছিলেন। তিনি পর বৎসর (১৯১৯) খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষাশেষি দেশে ফিরলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ আবার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। জালিয়ানাওয়ালা বাগের প্রান্তরে ভারত রক্তস্নান করেছিল। দেশের সংকট মূহূর্তে তিনি দেশবাসীর পাশে থাকতে পারেন নি ব'লে তিলক প্রায়ই আফসোস করতেন।

পঁচিশ

তিলক যখন ইংলণ্ড রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, তখন কংগ্রেসের ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লী অধিবেশনের জন্যে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড থেকে তাঁর ফিরতে দেরী হওয়ায় মদনমোহন মালবীয় কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। দিল্লী কংগ্রেসে তিলকের নীতিই জয়যুক্ত হয়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার ভারতের বিক্ষুব্ধ জনতাকে কিছু পরিমাণে শান্ত করবার চেষ্টায় একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করলো। এই সংস্কার "মণ্ট-ফোর্ড" সংস্কার নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবিত সংস্কার গ্রহণ করা হবে, না, বর্জন করা হবে, তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। গান্ধীজীর নেতৃত্বে একদল বললেন, এই সংস্কার গ্রহণ করাই উচিত। আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে অপর দল বললেন, একে যথেষ্ট নয় ব'লে বর্জন করা উচিত। কিন্তু সকলে তিলকের মতের জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো। তিলক এই সংস্কারকে যথেষ্ট নয় ব'লেই ঘোষণা করলেন। কিন্তু একে বর্জন করতেও

তিনি নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, “আমাদের নীতি হওয়া উচিত, যতোটুকু পাবো, তা নেবো ; কিন্তু আরো পাওয়ার জন্যে যুদ্ধ করবো।” অমৃতসর কংগ্রেসে তিলকের এই নীতিই গৃহীত হ’লো।

জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড, রাউলাট আইন প্রভৃতি ব্যাপার ভারতে বিক্ষোভের আগুন জ্বেলেছিল। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি বিজেতা ইংরেজদের অপমানজনক ব্যবহার ভারতীয় মুসলমানদেরও ক্রুদ্ধ ক’রে তুললো। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের ধর্মনেতা বা খলিফা। তাই তুরস্ক তথা তুরস্কের সুলতানদের প্রতি ইংরেজরা যে ব্যবহার করলো, তার প্রতিবাদে ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করলো। এই আন্দোলনকে ভারতের হিন্দু সমাজও নিজেদের সংগ্রামের অংশরূপে গ্রহণ করলো। ফলে ভারতের স্বরাজের দাবীর সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন সংযুক্ত হ’লো। গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে ভারত-ব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা গৃহীত হ’লো।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখ! ঐ দিন ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন সুরু হবে। কে জানতো যে, ঐদিন তিলকের জীবনেরও শেষ দিন!

তিলকের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তিলক তাই প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন। গান্ধীজী যে এ সংগ্রামে যোগ্য সেনাপতি, সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না। ভারতব্যাপী অহিংস সত্যাগ্রহ ও